খেলাফত ব্যবস্থাঃ তত্ত্ব, ইতিহাস ও যুগের বাস্তবতা

ওভামির আঞ্জুম

“খিলাফত” এর মতো এরকম বহুমাত্রিক ও বহু অর্থসম্পন্ন শব্দ কারো কারো মনে গভীর স্মৃতিকাতরতা তৈরি করে, আবার কারো কাছে তা আবির্ভূত হয় অশুভ ভীতি আকারে। কিছু বিচ্ছিন্নতা বাদ দিলে প্রায় চৌদ্দশত বছর ধরে মুসলিম বিশ্ব আর খিলাফত ছিল সমার্থক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওসমানী খেলাফতের পতন ইসলামী দুনিয়াকে গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন করে তোলে। তারই ফলশ্রুতিতে খিলাফতকে আবার ফিরিয়ে আনার চিন্তা জন্ম দিয়েছে অসংখ্য আন্দোলন ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকল্পের। তবে শীতল যুদ্ধকালীন সময়ে উত্তর-ঔপনিবেশক রাষ্ট্র তৈরির ডামাডোলে খেলাফতের প্রতি এই আকর্ষণ অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। বর্তমানে জাতিরাষ্ট্র প্রকল্পের ব্যর্থতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিনিয়ত ক্ষতি বৃদ্ধি করে চলেছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিগোলকায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনই মুহূর্তে বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে এই চিন্তা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যে, খিলাফতই একমাত্র সভ্যতাগত বিকল্প যা অরক্ষিতদের রক্ষাকবচ হতে পারে। পন্ডিত মহলে এই চিন্তা সবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও মুসলিম বিশ্বে জনসাধারণের মাঝে একটি নিখিল ইসলামি সংঘের ধারণা ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বে প্রায় প্রতিটি গণজাগরণকে জোরপূর্বক দমন করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে শাস্তিমূলক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়াও নিত্তনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। আর ইউরোপ আমেরিকায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে তৈরি করা হচ্ছে নতুন নতুন বাধার দেয়াল। তারই ফলশ্রুতিতে একটি বৈশ্বিক ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তার অনুভুতিও মুসলিমদের মাঝে গভীর থেকে গভীর হচ্ছে।

সম্প্রতি ন্যায় খিলাফত গঠনের চিন্তার পিছে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে অন্যায় খিলাফত-এর উত্থান। তথাকথিত “ইসলামিক স্টেইট অফ ইরাক এন্ড সিরিয়া” (ISIS, যা ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) নামেও পরিচিত) – এর আকস্মিক উত্থান আর লজ্জাজনক পতন এই ধারণার গ্রহণযোগ্যতাকে আরো বেগবান করেছে। এমনকি উক্ত অঞ্চলের পপুলিষ্ট নেতারাও সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে আছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তায়্যিব এরদোয়ান, যিনি ওসমানী খিলাফতের জন্য বিশ্বের মুসলিমদের স্মৃতিকাতরতাকে নিজ পক্ষে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, জনপ্রজাতন্ত্রী তুরস্ক ওসমানী সাম্রাজ্যেরই ধারাবাহিকতা; সমর্থকরা যখন এরদোয়ানকে সুলতান এরদোয়ান হিসেবে সম্মোধন করে থাকেন সেটা মূলত একটা শুন্যতাকেই নির্দেশ

করে। আর এই শুন্যতার অনুভুতি মুসলিম বিশ্ব জুড়ে ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্র হচ্ছে।[১] তুরস্কের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হয়তো সংক্ষিপ্ত হতে পারে, কিন্তু তার জাগিয়ে তোলা আকাঙ্ক্ষার স্থায়ীত্ব স্বল্পকালীন নয়।

অল্প কিছুদিন পূর্বেও খিলাফতের পুনঃর্জীবন এর পক্ষের আলাপকে ধর্মান্ধ, রোমান্টিকতাবাদী অথবা কট্টর ঐতিহ্যবাদী হিসেবে অভিহিত করা হতো। সমালোচনাকারীরা এটাকে কল্পিত স্বর্ণযুগের জন্য অর্থহীন স্মৃতিকাতরতা হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। অন্যদিকে মূলধারার ইসলাম পন্থীদেরকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জাতিরাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে নিতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ খ্রিষ্টীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিকেই অনুকরণ করছেন। অন্যদিকে আরেকটি পক্ষ কিছুটা অস্বস্তির সাথে মুসলিম দেশসমুহের মধ্যে ইউরোপিয় ইউনিয়নের মতো একটি কনফেডারেশনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তবে তা এখনই সম্ভব নয় সেটাও স্বীকার করে নেন। এই বাস্তববাদীরা তাদের সকল আপোষ সত্ত্বেও নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে ও নিজেদের ওপর চলা দমন-নিপীড়ন এড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। আরব বসন্ত পরবর্তী সময়ে এটা পরিস্কার যে তারা তরূণদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতেও যথেষ্টভাবে সক্ষম হয়নি। তবে মুসলিম জনসাধারণের অসহায়ত্ব এবং মুসলিম শাসক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ যেমন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি তার সঠিক চিত্রও সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সাথে সাথে সংকীর্ণ জাতিবাদি ধারণার বাইরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিম উম্মাহর ধারণা বেশ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি একক সরকার ব্যবস্থা হিসেবে খেলাফত ব্যবস্থার পুণঃপ্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের নানান প্রান্তে ক্রমেই বেড়ে চলা নিরাপত্তার চাদরহীন মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এই ব্যবস্থা এমন আশাই এর মূল কারণ।

সম্প্রতি মুসলিম বিশ্বে খিলাফতের প্রবল জনপ্রিয়তা নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। লেখক তার গবেষণার মধ্য দিয়ে দাবি করেন যে মুসলিম সমাজে খেলাফতের প্রতি জনসমর্থন পশ্চিমের অনেকের ধারণার চেয়েও বেশি[২]। এমনকি এর মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা আইসিসকে ঘৃণা করেন কিংবা ধর্মীয় সহিংসতাকে তীব্রভাবে নিন্দা করে থাকেন। পরবর্তী ঘটনাবলি মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসকদের নোংরা ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতি এবং ফেরকাগত সহিংসতার সূত্র ধরে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সম্মিলিত মুসলিম পরিচয়কে গ্রহণ করে নেয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিচয় ভীষণভাবে বৈশ্বিক এবং রাজনৈতিক হওয়ায় তা তরূণদের নিজেদেরকে একটি কমিউনিটির অংশ হিসেবে কল্পনা করতে উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে এই কমিউনিটির পক্ষে একটি বাসভূমির নিয়ন্ত্রণ লাভ অনেক সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবে এমনটি ভাবতে তারা ক্রমে আগ্রহী হচ্ছে।[৩]

খিলাফত পুনরুত্থানের চিন্তার বিরুদ্ধে যে আপত্তিগুলো আছে সেগুলোকেও আপাতত খুব শক্তিশালী মনে হয়। এই আপত্তিগুলো তিন প্রকারেরঃ এটি অনাকাঙ্ক্ষিত, বাস্তবায়ন অযোগ্য এবং ধর্মীয়ভাবে অপ্রয়োজনীয়। খিলাফত অনাকাঙ্ক্ষিত কারণ এটিকে মধ্যযুগীয় ও স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ভাবা হয় (যদি একে আদৌ ব্যবস্থা বলা যায় আর কি!)। এটি মানবাধিকার, প্রগতি, নাগরিকত্ব, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা পূর্ববতী একটি আদিম যুগের ইঙ্গিতবাহী এমনটাই তারা মনে করেন। তাছাড়াও এটি আইসিসের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে জড়ানো একটি ধারণা এবং এটা যে কারণে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা খুবই নিকৃষ্ট। এমনকি এর সমর্থনকারী ও বিরোধিতাকারী উভয় শিবিরেরই দৃষ্টি এর দিকে নিপতিত এর জঘন্যতম কর্মকাণ্ডের কারণেই। দ্বিতীয়তঃ এটিকে বাস্তবায়ন-অযোগ্য মনে করা হয়

কারণ তারা মনে করেন জাতিরাষ্ট্র এর সকল বিচ্যুতি স্বত্তেও তা স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে থেকে যাবে। শেষতঃ এটিকে ধর্মীয়ভাবে অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। এর কারণ হিসেবে দাবী করা হয়ে থাকে যে, খিলাফত প্রথমত কোনো ইসলামী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয় বরং প্রকৃতির দিক দিয়েও তা ঐতিহাসিক। ফলে তাদের মতে এটা কখনোই এর আদর্শরূপে সমস্ত মুসলমানদের ওপর একীভূত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। আমি আমার এই প্রবন্ধে এই দাবীগুলোর পর্যালোচনা করবো।

খিলাফতের আদৌ কোনো তাৎপর্য আছে কিনা এমন আলাপই খিলাফতকেন্দ্রীক বিতর্কের অন্যতম উৎস। খিলাফতের কথা বললেই এর বিরোধিতাকারীদের মনের মধ্যে মধ্যযুগীয় নিরঙ্কুশ ধর্মীয় একতান্ত্রিকতার চিত্র ভেসে উঠে। অন্যদিকে এর সংস্কারবাদী সমর্থকদের নিকট তা তাইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে মুসলিম সরকারসমূহের একটি কনফেডারেশন মাত্র। (তবে তার পরিণতি অবশ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাইতে উত্তম হবে এমনটি আশা করা হয়। হয়)। কারো কাছে খিলাফত একালের রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের প্রাক-আধুনিক বিকল্প। আবার কারো কাছে খিলাফত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্রসমূহের উত্তরাধুনিক একত্রীকরণ। উভয় ধারণাই খিলাফতকে কেন্দ্র করে ইসলামী পুঙ্খনাপুঙ্খ বিশ্লেষণী (discursive) ঐতিহ্যের জটিল এবং সমৃদ্ধ আলোচনাকে এড়িয়ে যায়। তাই এই উভয় ধারণার উপরই আলোচনা এবং এগুলোর বিনির্মাণ হওয়া উচিত।

> খেলাফতকে কল্পনা করা যেতে পারে একটি সুবিচার, জবাবদিহিতা মূলক এবং মানবাধিকার সচেতন শাসন ব্যবস্থা যা অনেকগুলো আঞ্চলিক সরকারের একটি নমনীয় সংঘ আকারে কাজ করবে। এ সংঘের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রেই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত অবস্থায় থাকবে। আমার মতে এমন একটি ব্যবস্থাই পারে মুসলিম সমাজের ধারাবাহিক অবনমন এবং সন্ত্রাসীদের আখড়া হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। এভাবেই একমাত্র তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত হওয়া বাস্তবতা এড়ানো সম্ভব।

খিলাফত অথবা আদর্শ খিলাফত এখন আর নেই এজন্য একে বাস্তবায়ন অযোগ্য ভাবা মূলত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাহসের অভাবকেই নির্দেশ করে। গণতন্ত্রও তো একটি ছোট গ্রীক নগররাষ্ট্রে সীমিত আকারে শুরু হয়েছিল এবং কয়েকশত বছর সমৃদ্ধি লাভ করে পরবর্তী দুহাজার বছরের জন্য উধাও হয়ে যায়।[৪] এর দ্বিতীয় পুনরুত্থানের সময়ও প্রথমদিকে নিন্দনীয় অর্থেই এর উদ্ভব ঘটে। আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাগণ রিপাবলিকান গণতন্ত্রকে একটি স্ববিরোধী ধারণা হিসেবে দেখতেন, কিন্তু শেষমেশ তারা জনগণের চাপের কাছে নতিস্বীকার করেন।[৫] কোনো একটি চিন্তা হাল আমলে জনপ্রিয় না বলেই তা অবাস্তবায়ন অযোগ্য এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই।

খিলাফত সর্বনিম্ন পর্যায়ে মুসলিমদের রাজনৈতিক একতা বোঝায় এবং খিলাফত এমন একটি ধারণা যেটিকে পুনঃআবিষ্কার করার খুব একটা প্রয়োজনও মুসলিমদের নেই। এই ধারণা কোরআনের প্রতিটি সামাজিক শিক্ষা, প্রতিটি নবুওতী শিক্ষা এবং এখন পর্যন্ত প্রতিটি জুমার খুতবায় উপস্থিত। ইতিহাস জুড়ে মুসলিমরা সবসময়ই এই ধারণার রাজনৈতিক বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনের ব্যাপারে একমত হয়েছে। খিলাফতের জন্ম ইসলামী আইনেরও আগে। ইসলামী আইনের উদ্ভব এবং তা সমাজের জন্য উপযোগী হয়ে উঠবার ক্ষেত্রে খিলাফত পূর্বশর্ত। বাস্তবে, সমস্ত মুসলিম ভূমি সবসময় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না

এবং প্যান-ইসলামী একতা এমন একটি আকাঙ্ক্ষা যার পূর্ণ বাস্তবায়নের উদাহারণ খুবই দুর্লভ। এদিক দিয়ে আদর্শ খিলাফত আদর্শ গণতন্ত্র এবং আদর্শ সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের মতোই। এই ধরনের সামষ্টিক আকাঙ্ক্ষাসমূহ খুব কমই তাদের আদর্শরূপে বাস্তবায়িত হয়, কিন্তু এটাই যেকোনো যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে নৈতিক কর্মদ্যোগ তৈরি করতে পারে। আমি এ ধরনের আদর্শকে বলি Asymptotic আদর্শ। উচ্চ মাধ্যমিকের ক্যালকুলাসপ্রেমিক ছাত্রদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা যে, Asymptote এমন একটি সরলরেখা যা ক্রমাগত কোনো একটি বক্ররেখার কাছাকাছি হতে থাকে কিন্তু কখনোই তার সাথে মিলিত হয় না।

Asymptotic আদর্শ আর ইউটোপিয়ান আদর্শ এক নয়। প্রথমটি বাস্তব, যৌক্তিক এবং কখনও কখনও তা অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তবে এর পরিপূর্ণতার জন্য সবসময়ই কাজ করে যেতে হয়। রাজনৈতিক তাত্ত্বিক শেল্ডন উলিন ঠিক একই চিন্তা পেশ করেছেন যখন তিনি গণতন্ত্রকে বর্ণনা করার সময় অনিয়মিত (episodic) এবং বিচ্যুতিপ্রবণ (fugitive) বিশেষণদ্বয় ব্যবহার করেন।[৬] জীবন উৎসর্গ করা যায় এমন সমস্ত অর্থপূর্ণ মানবীয় আদর্শই Asymptotic, যাদের মধ্যে ইসলামের ধর্মীয় আদর্শও অন্তর্ভুক্ত, যেমনঃ প্রিয় রাসূলের (সা) সুন্নাহ, গুনাহ এড়িয়ে চলা, সবকিছুর ওপর আল্লাহকে প্রাধান্য দেয়া এবং সত্যবাদী, ন্যায়বান এবং সাহসিকতা সবই একই Asymptotic আদর্শেরই অংশ। আমি বলবো, কারো Asymptotic আদর্শ থাকা তার প্রকৃত বিশ্বাসেরই ইঙ্গিতবাহী। গণতন্ত্র, উদারতাবাদ, পুঁজিবাদ কিংবা সমাজতন্ত্রে প্রকৃত বিশ্বাসী তারাই যারা নিজ আদর্শকে তখনও আঁকড়ে ধরে যখন সেগুলোকে আপাতভাবে ব্যর্থ হতে দেখা যায়। মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্য এবং নবী মুহাম্মদের (সঃ) এর শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা আদর্শিকভাবে ইতিহাস জুড়ে মুসলিমদের পরিচয়ের অংশ ছিল। আমি পরবর্তীতে দেখাব যে এই আদর্শের ভিত্তি ইসলামের আদেশেরই অংশ।

খিলাফত তার সেরা দিনগুলোতেও কোনো ইউটোপিয়া ছিল না। তাই খেলাফত নিয়ে যেকোনো ভাব-বিলাসি চিন্তা অবশ্যই পরিত্যজ্য। খেলাফত কোনো যাদুকরি প্রতিষ্ঠান নয় যা কেবল একটি ঘোষণার জোরে মুসলিমদের স্বাধীনতা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারবে। এমনও নয় যে খেলাফত তার পুরো ১৩০০ বছরের ইতিহাসে সর্বদা অবিচ্ছিন্ন থেকেছে এবং সমস্যাবিহীনভাবে কাজ করেছে। অবশ্য অনেক সমালোচকগণ চৌদ্দশত বছর ধরে ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতকে কিছু মাপকাঠিতে অবিকলভাবে উত্তীর্ণ দেখতে চান। অথচ এ সমস্ত মাপকাঠিতে শুধু খেলাফত কেন, কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই উত্তীর্ণ হতে সক্ষম নয়। ইসলামে মিথ্যা হলফ, সুদ, নিরীহ মানুষের হত্যা ইত্যাদির ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে এটা সত্য। তবে তার মানে এটা নয় যে বাস্তবে সর্ব অবস্থায় তার পুর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছে। নিজেদের সুবিধামতো ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরণের খুঁতখুঁতে মনোভাব কেবল অন্যান্য মুসলিমদের প্রতি করা খারেজিদের সহিংসতাকেই মনে করিয়ে দেয়। খারেজিরাও নিজেদের মনগড়া এমন কৃত্রিম সব মানদণ্ড দাঁড় করিয়েছিল। খারেজিরা বলত কুরআনই যথেষ্ঠ এবং তারা যেভাবে বুঝেছে সেটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা। এমনকি তারা এক্ষেত্রে কোনো বিশেষজ্ঞ সাহাবির সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি যারা তখনও জীবিত এবং কুরআনকে সরাসরি নাযিল হতে দেখেছেন। অতপর তাদের এই কৃত্রিম মাপকাঠিতে যারাই উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদেরকেই তারা অপরাধী সাব্যস্ত করেছে। বিশেষ করে খারেজিরা শাসনকার্যের অপূর্ণতাকে চিহ্নিত করে খলিফাদের বৈধতাকে সরাসরি নাকচ করে দিত। এমনকি এই সব মাপকাঠির আলোকে তাদের ফেরকার নেতারাও তাদের ঘৃণা থেকে রক্ষা পেত

না। খেলাফতের অস্তিত্ব কখনোই ছিল না এমন দাবির পেছনে যুক্তি হচ্ছে

> খেলাফত সর্বদা সমন্বিত ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করেনি; কিংবা তা সর্বদা সবক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা দেখাতে সক্ষম হয়নি। এমন যুক্তি মেনে নিলে আমাদের এটাও মেনে নিতে হবে ইতিহাসে কখনো কোনো মুসলিমের অস্তিত্বই ছিল না কারণ তারা সবাই ছিল ত্রুটিপূর্ণ; একইভাবে পৃথিবীতে কোনো গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই কারণ সব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু এ ধরণের যুক্তি একই রকম উদ্ভট বৈ কিছুই নয়।

অন্যদিকে আধুনিক সেকুলারপন্থীরা খেলাফত আদৌ কাঙ্ক্ষিত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা বলতে চান খেলাফত মূলত মুসলিমদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং অখন্ডতার কথা বলে; অথচ, তাদের মতে, এ বিষয়গুলি ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের প্রশ্নে মোটেও গুরুত্বপুর্ণ কিছু নয়। আমরা এখন এ বিষয়টি নিয়েই কথা বলব। এতক্ষণ আমরা খেলাফত আদৌ সম্ভব কিনা এ বিষয়ে আলাপ করেছি। আমরা দেখিয়েছি সম্ভাব্যতার প্রশ্নে ঐতিহাসিকভাবে খেলাফতের নানান অপূর্ণাঙ্গতাকে হাজির করা হয়; অথচ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন না হওয়াটা খেলাফতের অসম্ভাব্যতাকে মোটেই প্রমাণ করে না। অবশ্য সম্ভাব্যতার আলাপকে পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় মনে করার কারণ নেই। কেননা তা ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী ফরজ-ওয়াজিব নির্ণয় এবং অগ্রধিকার ঠিক করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে। তাই আমরা এ আলাপকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা না করে বরং খেলাফত কেন সম্ভব বা কোন অর্থে সম্ভব তার পক্ষে যুক্তি হাজির করতে চেষ্টা করেছি।

সুতরাং এখন আমরা দেখব খিলাফত আদৌ কাঙ্ক্ষিত কিনা। বিশ্বাসীদের জন্য ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রশ্নটি সর্বদা খোদায়ী বিধানের অধীন। সর্বোপরি আল্লাহর আদেশের মধ্যেই রয়েছে চুড়ান্ত কল্যাণ যদিও তা আমাদের দৃষ্টিগোচর না হয়ে থাকে। আল্লাহ জানে কিন্তু তোমরা জানো না।[৭] তবে অবশ্যই আল্লাহর যেকোনো আদেশকে ইসলামী ফিক্বহের কাঠামোর মধ্যে থেকে বুঝতে হবে। ইসলামি ফিক্বহ মূলত আদেশ, নিষেধ এবং উপদেশের সমষ্টি যা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির আলোকে কাঠামোবদ্ধ (বিভিন্ন উলামার মতে বিভিন্নভাবে)। আর এই পদ্ধতিগত কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হচ্ছে বাস্তবভিত্তিক অগ্রাধিকার, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সক্ষমতা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক নিশ্চয়তার প্রশ্ন।

হুজ্জাতুল ইসলাম আল-গাজালী (রহ.) এর মতো ইসলামের কিছু কিছু সামনের সারির আলেমগণ খিলাফতকে অন্য যেকোনো ধর্মীয় ইবাদতের মতো একে ফরয হিসেবে গণ্য করেছেন। খেলাফত ফলপ্রসু কিনা সেটা এই ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ তারা খিলাফতকে এর রাজনৈতিক কার্যকারিতা ও উপযোগিতা থেকে আলাদা করেছেন। অন্যদিকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এবং ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনী (রহ.) এর মতো আলেমগণ খিলাফতের যৌক্তিক প্রকৃতির উপর জোর দিয়েছেন। আমার কাছে অবশ্য দ্বিতীয় মতই অধিক জোরালো মনে হয়। এটা মনে রাখা দরকার যে খেলাফত একটি বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা আর মুসলিমরা আজকে বৈশ্বিকভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত-সহ নানা চ্যালেঞ্জের মূখোমুখি। এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সক্ষমতা প্রমাণ করার মধ্য দিয়েই কেবল খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান বৈশ্বিক কাঠামোকে আমরা জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। আর এ

কাঠামোকে অতিক্রম করে প্যান ইসলামিক একত্রীকরণের যেকোনো প্রচেষ্টাকে উপর্যুক্ত সমস্যাবলি নিয়ে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন হতে হবে। এই ধরণের প্রচেষ্টায় এবং সার্বিক সংলাপ ও পুনঃনির্মাণের কাজে অবশ্যই বঞ্চিত ও প্রান্তিকসহ সকল মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একইভাবে মুসলিম দেশসমুহের অমুসলিম নাগরিক, আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশসমূহ এবং বৈশ্বিক পন্ডিত ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

> সংক্ষেপে বলতে গেলে, খিলাফতের ধর্মীয় ফরযিয়াতের পক্ষে যুক্তি দিতে গেলে আমাদেরকে কোরআন-সুন্নাহ এবং ফিকহী ঐতিহ্যের স্মরণাপন্ন হতে হবে, কিন্তু এর বাস্তবায়নযোগ্যতা ও বাঞ্ছনীয়তাকে প্রমাণ করতে গেলে আমাদের ইতিহাস ও রাজনীতির (তথাকথিত ফিকহ আক-ওয়াকি) দিকেও নজর দিতে হবে। বাস্তবে খিলাফতের বিষয়ে অন্য যেকোনো বিষয়ের মতোই এই দুই প্রকারের বয়ান ফিকহ ও বাস্তবতার মাঝে দ্বান্দিক মিথষ্ক্রিয়ার (dialectically) মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। যদি এসবকিছু বিবেচনায় রেখে বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা যায় তাহলে এর ফলাফল শুধুমাত্র মুসলিমদের কাছেই নয় সমস্ত সদিচ্ছাপ্রণোদিত মানুষের কাছেই অধিক বরণীয় হবে।

গত কয়েকদশক ধরে বিশ্বায়নের ফলে মুসলিমদের মধ্যে নিজেদের অবস্থার ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে উঠেছে। ফলে অনেকের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হয়েছে যে তাদের সকলের সার্বিক পরিস্থিতি এবং গন্তব্য এক। একইসময়ে প্রতিটি সমাজেই ধনী ও গরীবের মধ্যে ব্যবধান নিদারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালে সংঘটিত আরব বসন্ত প্রায় দু ডজন আরবভাষী দেশের জনপরিসরের মধ্যকার ঐকতানকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছিল, তেমনি তাতে নিয়ে এসেছিল গভীর স্বস্তি। এই জনজাগরণের যে আলোড়ন তা সমাপ্তি থেকে এখনো বহুদূরে। তবে এর আপাতঃ ট্রাজিক ফলাফল জাতিরাষ্ট্রের স্বার্বভৌমত্বের ফাঁপা অবস্থাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। কারণ এই একই সময়ে আমরা দেখেছি কিভাবে জাতীয় সীমা অতিক্রম করে আতাত গড়ে উঠেছিল তেল ভিত্তিক রাজতন্ত্র ও সামরিক শাসকদের মধ্যে। সেইসাথে উলামাতন্ত্রের চেহারাও এই সময়ে উন্মোচিত হয়ে পড়ে যারা বরং খুশি মনে সকল গণহত্যা ও গণগ্রেফতারকে সমর্থন করে যেতে থাকে। অর্থাৎ একদিকে শাসকগোষ্ঠি রাজনৈতিক দিক দিয়ে অবৈধতার চুড়ায় পৌছেছে, অন্যদিকে স্টাব্লিশমেন্টের পক্ষের ওলামাশ্রেণী তাদের নৈতিক দেউলিয়াপনার চুড়ান্ত রূপ প্রদর্শণ করেছে। মুসলিম জনগোষ্ঠী এর নিচে পড়ে কেবল পিষ্ট হচ্ছে। মুসলিম সমাজগুলো হয়ে পড়ছে জীবনযাপনের অনুপোযোগী। ফলশ্রুতিতে মহামারি আকারে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে। (এর মধ্যে সন্ত্রাসবাদ অন্তর্ভুক্ত, তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পারিবারিক পরিসরসহ দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানান পরতে পরতে চলতে থাকা বিভিন্ন ধরণের সহিংসতা যা ব্যক্তি এবং কমিউনিটি উভয়কেই স্পর্শ করেছে)। ঘটছে ধর্মের ব্যাপারে মোহমুক্তি অথবা ছড়িয়ে পড়ছে উগ্রতা, সাধারণভাবে নৈতিক নৈরাশ্যবাদও ছড়িয়ে পড়ছে।[৮]

১৯৮০র দশকে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো নয়া উদারনীতিবাদ গ্রহণ করে এবং তার প্রচার ও প্রসারণ করতে উদ্যোগি হয়। ঠিক তখন থেকেই জাতিরাষ্ট্রের মডেল ধীরে ধীরে অকার্যকর হতে থাকে। বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মাধ্যমে নয়া-উদারনীতিবাদ প্রচার-প্রসারণের ফলে পুরো বিশ্বে জাতিরাষ্ট্রের মডেল ধীরে

ধীরে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ১৯৯০র দশক থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রভাবশালী লেখনীর শিরোনামে এ বিষয়ে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে যেমন, □The End of Nation-State□ (জাতিরাষ্ট্রের সমাপ্তি), □The Clash of Civilizaion□ (সভ্যতার সংঘাত)[৯], □Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World□ (জিহাদ বনাম ম্যাকওয়ার্ল্ডঃ কিভাবে বিশ্বায়ন ও গোত্রায়ন পৃথিবীকে পুনঃগঠিন করছে)[১০] এবং □Endgames: Questions in Late Modern Political Thought□ (শেষদানঃ আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তার সাম্প্রতিক প্রশ্নসমূহ)[১১]। এই লেখনীগুলোতে প্রচলিত জাতিরাষ্ট্রের বিলয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও তুলে ধরা হয়েছে আঞ্চলিক স্বৈরশাসকদের যোগসাজশে বৈশ্বিক পূজিবাদের উত্থানের গল্প। আর এই পূজিবাদের উত্থানের পেছনে ভূমিকা রেখেছে পুঞ্জিভূত সম্পদ যা ক্রমাগত বেড়ে চলা মানুষ ও শ্রেণিকে শোষণ করার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। এ শক্তিগুলো জাতিরাষ্ট্রের নানান কল-কব্জাকে নতুন উদ্দেশ্য অর্জনে ঢেলে সাঁজিয়েছে জাতিরাষ্ট্রের উপকরণগুলোর উদ্দেশ্যকে নতুনভাবে ঢেকে সাজিয়েছে। জাতিরাষ্ট্রের স্বর্ণালী যুগেও (উনবিংশ শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত) এটি বিমূর্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আড়ালে নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার ছিল। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একজন সামনের সারির প্রফেসর তাঁর বই □Sovereignty: Organized Hypocrisy□ (সার্বভৌমত্বঃ একটি সংগঠিত দ্বিমুখীতা)[১২]-তে বিষয়টি দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে□দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের কথিত সার্বভৌমত্ব কিভাবে বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলো দ্বারা নিয়মিত লংঘিত হয়েছে। কিন্তু জাতিরাষ্ট্রের এই সার্বভৌমত্বের কল্পকাহিনী দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতায় থাকা ক্রীড়ানকদের রক্ষণাবেক্ষণে বেশ কাজে দিয়েছে। জাতিরাষ্ট্রের সমাপ্তি সংক্রান্ত বেশিরভাগ লেখনীই আমাদের সময়ের বড় বড় সংকটসমূহকে মোকাবেলায় এর অক্ষমতাকে তুলে ধরেছে। অর্থাৎ মানবসৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয় ও আয়বৈষম্য থেকে শুরু করে ক্রমবর্ধমান শরণার্থী সংকটের (অনাগরিকদের উত্থান) কোনোটাই সে মোকাবেলায় সক্ষম নয়। ফলে সমাধান হিসেবে এই ধরণের চিন্তা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রস্তাব পেশ করেছে।[১৩]

দুঃখের ব্যাপার এই যে, যে মুসলিমরা ঐতিহাসিকভাবে শিল্পবিপ্লব থেকে সবচেয়ে কম লাভবান হয়েছে, তারাই এর অনিবার্য পরিণতি, পরিবেশ বিপর্যয়ের সর্বপ্রথম শিকার হতে যাচ্ছে। □আমরা একটি পরিবেশগত বর্ণবৈষম্যের দিকে এগিয়ে চলছি□ যেটাতে গরীবরা দুর্ভোগ পোহাবে, কিন্তু ধনীরা নিজেদের রক্ষা করে নেবে; জাতিসংঘের একটি রিপোর্ট এমন আতঙ্কের কথাই জানান দিচ্ছে।[১৪] মুসলিমরা নিশ্চিত থাকতে পারে যে, রাজতান্ত্রিক ও সামরিক শাসিত দেশগুলোতেই এই বিপর্যয় সবচেয়ে নারকীয় আকার ধারণ করবে। অল্পকথায় বলতে গেলে, মুসলিমদের জন্য জাতিরাষ্ট্র সবসময়ই অমানবিক, বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং নারকীয় প্রমাণিত হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা জারী থাকবে। তবে এই পরিস্থিতির জন্য শুধু ঔপনিবেশিকদের তৈরি করা বিভেদকে দায়ী করা যথেষ্ট নয়। কিংবা মুসলিমদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে তাদের আগাম পরিকল্পনাকে চিহ্নিত করাই শেষ কথা নয়। বরং আসল কথা হচ্ছে জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।[১৫]

স্বপ্ন, অতীত এবং ভবিষ্যত

মানুষ তার অতীত স্মৃতি এবং ভবিষ্যত নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝেই বেঁচে থাকে। মানুষ তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত উন্নতি যেমন কামনা করে তেমনি সে চায় ভালবাসার মানুষদেরকে

বিপদে-আপদে আগলে রাখতে। বর্তমানকে উৎরে গিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এমন স্বপ্নই মানুষকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অন্যথায় জীবন হারিয়ে যায় গভীর নৈরাশ্যের আঁধারে। এ ধরনের ডিস্টোপিয়ান নৈরাশ্যবাদ অনেকসময় বড় বড় বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছে। এমনকি অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যবাদীরাও কল্পনার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। চার্চিল একবার বলেছিলেন, “কেউ যদি পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে মার্ক্সবাদী না হয়, তার হৃদয় বলতে কিছু নেই, কিন্তু কেউ যদি পয়ত্রিশে গিয়েও মার্ক্সবাদী থাকে তবে তার ঘিলু নেই”। মার্ক্সবাদ কিংবা অন্য যেকোনো প্রগতিশীল প্রকল্প প্রচলিত ধর্মের বিকল্প হিসেবে উত্তর গোলার্ধের সেকুলার যুবকদের কাছে চিহ্নিত হয়েছে। কারণ পুঁজিবাদ যেখানে ক্রমেই হতাশা বাড়িয়ে চলছে এসব তত্ত্ব পৃথিবীকে রক্ষা করার আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে। তাছাড়া অনেকটা পরকালীন তত্ত্বের মতো করে এসব চিন্তা উন্নত ভবিষ্যত নির্মাণের স্বপ্ন ও প্রকল্পের কথা বলে। একটি বিশ্বসম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমদেরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে লালন করতে হবে যার মধ্যে সবাই অংশীদার হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম বিশ্বে এরকম ভবিষ্যতমুখী আশাবাদি প্রকল্পের বদলে আইসিসের মতো কেয়ামতকামি ধংসাত্মক ও নৈরাশ্যবাদি চিন্তা ও শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। আর এর পেছনের মূল কারণ হচ্ছে স্বৈরাচারী শাসক কর্তৃক অরওয়েলীয় কায়দায় ধর্মের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং ইসলামের যেকোনো ভিন্ন দর্শন ও প্রকল্প তৈরির প্রচেষ্টাকে নির্মম দমন। তাদের এই কর্মকান্ডের সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ যা কেবল ইসলামের সবচেয়ে অসাড় সংস্করণ ব্যাতিরেকে বাকিসব ধারাকে দানবিক বলে প্রচার করে। এই বিদ্যমান অবস্থা নতুন সহস্রাব্দের মুসলিম তরুণদের একটি পুরো প্রজন্মের চেতনাকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে। এদের একদিকে রয়েছে সেসব তরুণ যারা মুসলিম হয়ে জন্মানোর জন্য আফসোস করে, আরেকদিকে রয়েছে সে দল যারা একই কারণে ক্রোধান্বিত। একমাত্র নিজের উপর আস্থাশীল ইসলামই ভবিষ্যতে পূর্ণ শক্তিমত্তা নিয়ে টিকে থাকবে। এই ইসলাম পৃথিবীকে কল্পিত দানবিক ইসলাম থেকে রক্ষা করতে উদ্যত হবে না বরং নিজের আসল রূপে জাহির হওয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করবে। এই রূপকল্পকে প্রফেসর সালমান সায়্যিদ তাঁর শক্তিশালী ও বর্ণাঢ্য বই “Recalling the Caliphate”-এ এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

> “খেলাফতকে স্মৃতিচারণ করার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এটা অনুধাবন করার মধ্যে যে মুসলিমরা সম্মিলিতভাবে যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে সেটা যে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক না বরং রাজনৈতিক, এবং এর সমাধান ইসলাম নির্ভর রাজনৈতিক প্রকল্প বিনির্মাণের মধ্যেই একমাত্র পাওয়া যেতে পারে। এই রাজনৈতিক প্রকল্পের একমাত্র আবশ্যিক উপাদান হচ্ছে ঐতিহাসিক পরম্পরায় জারি থাকা প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম, যার সূচনা হয়েছিল রাসুল (সঃ) এর প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। “খিলাফতের স্মৃতিচারণ তাই একটি বিঔপনিবেশিক ঘোষণা, একটি স্মরণিকা যে, ইসলাম ইসলামই এবং মুসলিমদের জন্য এটাই যথেষ্ট।”[১৬]

এই আহবানের বাস্তবায়ন হয়নি অনেক লম্বা সময় ধরে। প্রায় একশো বছর ধরে ইসলামকে ইসলাম হিসেবে থাকতে দেয়া হয়নি। শীতল যুদ্ধের পর পশ্চিমা ব্যবস্থাই বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়। কনজার্ভেটিভ শিবিরের হান্টিংটন (“অন্যরা আমাদের থেকে আলাদা, আমাদের তাদের সবার বিরুদ্ধে

লড়তে হবে) থেকে শুরু করে লিবারেল শিবিরের ফুকুয়ামার (আমরাই ইতিহাসের চুড়া, আমাদের উচিত বাকি সবাইকে এই প্রকল্পে অঙ্গিভূত করা) মতো এই ব্যবস্থার প্রবক্তাগণ নতুন লড়াইক্ষেত্র ও নতুন শত্রুর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। উদারনৈতিক মতবাদের টিকে থাকার জন্য পূঁজিবাদের মতো প্রতিনিয়ত সাম্রাজ্য বিনির্মাণ ও তার বিস্তারের দরকার পড়ে এবং এর একচ্ছত্র বিজয় পুরো পৃথিবীকে বৈচিত্র্যহীনভাবে তার অধীনে নিয়ে এসেছে। এর সমর্থকরা বৈচিত্রের দাবি করলেও উদারনৈতিক মতবাদের বাইরে অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে তারা নিজেরাই সংশয়ে ভোগে। নৃতাত্ত্বিক ক্লিফোর্ড গির্টজ উদারনৈতিক মতবাদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, আবার একজন নৃতাত্ত্বিক হিসেবে মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অকৃত্রিম বৈচিত্র্য রক্ষা ও তার যেকোনো সরলীকরণের বিরুদ্ধে তিনি সচেতন ও সোচ্চার ছিলেন।। নিজের এই দুই পরস্পর সাংঘর্ষিক অবস্থান নিয়ে তিনি মর্মবেদনায় ভুগতেন। তাঁরই সহকর্মী রিচার্ড শুডার এই টানাপড়েনকে কেন্দ্র করেই উদারনৈতিক পূজিবাদই মানুষের একমাত্র ভবিষ্যত গন্তব্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অন্যসব সভ্যতাকে বিলীন করে একক সভ্যতা আকারে যেভাবে উদারনৈতিক পূজিবাদ হাজির হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পৃথিবীর ভবিষ্যত তিনি ভাবনার রশদ হিসেবে পরিষ্কারভাবে সম্ভাব্য তিনটি ভবিষ্যত গন্তব্যের কথা আমাদের সামনে পেশ করেছেন।

> এটা দেখতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যে, ইতিহাস কি একটি সার্বজনীন সভ্যতার মহিমাময় বিকাশের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে (ভবিষ্যদ্বাণী ১), নাকি বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদভিত্তিক আলাদা আলাদা সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র প্রচলন লাভ করবে (ভবিষ্যদ্বাণী ২), নাকি মানবজাতি পূপ্রাক-আধুনিক যুগের নানান উদাহরণ অনুসরণ করে বহুজাতিভিত্তিক সাম্রাজ্যে বসবাস করতে রাজি হবে যদিও তা উদারনৈতিক মতবাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শর্তের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।[১৭]

রিচার্ডের মতে, এই তৃতীয় সম্ভাব্য ভবিষ্যতেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত মানব সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা। আমারও এটাই মত যে, মুসলিমরা যৌক্তিকভাবে এই তৃতীয় সম্ভাব্য ভবিষ্যতকেই আলিঙ্গন করে নিতে পারে, যেখানে পৃথিবী হবে ভিন্ন ভিন্ন অকৃত্রিম সভ্যতার মিলনমেলা, কিন্তু যেগুলো পারস্পরিক সংঘাত নয় বরং সহযোগিতা ও সহাবস্থানকে নিজেদের নতুন ধ্রুব লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করবে।

উদারনৈতিক মতবাদের মিথ্যা সার্বজনীনতাই এর সবচেয়ে বড় স্ববিরোধিতা এবং দ্বিমুখীতা। ওয়ায়েল হাল্লাক তাঁর প্রকাশিত বই Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge[১৮] এ দেখিয়েছেন, এডওয়ার্ড সাঈদের মতো যারা সভ্যতার পারস্পারিক সংঘাতের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তারা একইসাথে ইসলামের সভ্যতাগত বাস্তবতাকেও নাকচ করে দিয়েছেন। অথচ ইসলামকে একটি সভ্যতাগত বাস্তবতা ও প্রশ্ন আকারে স্বীকার করে নিয়েই পারস্পারিক সংঘাতের ধারণাকে নাকচ করা সম্ভব এবং সেটাই অধিক ফলপ্রসু চিন্তা।

রক্তপ্রবাহ

সমাজবিজ্ঞানী অর্জুন আপাদুরাইয়ের একটা মতামত প্রবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে গণহত্যাপ্রবণ দেশগুলো বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের আক্রমণ করছে। ইসলাম কি আসলেই তাদের লক্ষ্যবস্তু?” প্রবন্ধটির উপশিরোনাম ছিল এরকমঃ “ইসরাইলের হাতে ফিলিস্তিনীরা যখন বন্দীদশায় এবং মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গারা বিতাড়িত, এমতাবস্থায় নৃতাত্ত্বিক ও বর্ণগত জৈব সংখ্যালঘুদের দুর্দশার ওপর একটি পর্যালোচনা।”[১৯] আমি মনে মনে ভাবলাম, ক্লাবে স্বাগতম! দশকের পর দশক মুসলিমরা নিজেদের এই প্রশ্ন করে আসছে যার উত্তরের ব্যাপারে তাদের বেশিরভাগেরই কোনো সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে লেখাটি কোনো নতুন তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিয়ে শেষ হয়নি বরং বিদ্যমান বহুল প্রচলিত গতানুগতিক ধারার উপলব্ধি বলা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার প্রবন্ধের লেখক একজন ভারতীয়-আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী, তিনি আলকায়েদার সামরিক অপারেশনের প্রতিশোধপরায়ণ কোনো কর্মী নন। সুতরাং গতানুগতিক হলেও তার লেখায় এমন চিন্তা হাজির হওয়াটা গুরুত্বের দাবি রাখে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোও যখন বাসযোগ্য হতে ব্যর্থ হচ্ছে অথবা বসবাসের অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ছে, তখন উত্তর গোলার্ধ নিজেদের সীমানায় দেয়াল গড়ে তুলছে। যুদ্ধ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, দুর্নীতি ও ক্ষুধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা নির্দ্বিধায় এমন একটি আধুনিক প্যান-ইসলামপন্থার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে যেটা তাদেরকে এসব মর্যাদাহানিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করবে। এখনকার বিশ্বায়ত পৃথিবীতে যখন পাশ্চাত্যের “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ”[২০] উলটো সব জায়গায় মুসলিমদের মধ্যে মুসলিমবোধ তরান্বিত করছে, ঠিক তখন ইসরাইল, চীন, মিয়ানমার, ভারত এবং অগণিত অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ পরিপূর্ণ দায়মুক্তির সাথে নিজেদের মর্জিমত তাদের “মুসলিম” সমস্যা”-র মোকাবেলা করছে। “আমাদের সংঘাত পুরো মুসলিম বিশ্বের সাথে, পুরো আরব বিশ্বের সাথে,” এমনটাই ঘোষণা করেছেন একজন ইসরাইলী রাজনীতিবিদ, যা ইউরোপ-আমেরিকাসহ অন্যান্য জায়গার ইসলামবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিধ্বনি।[২১] এসব মুসলিমদেরকে শেষমেশ আল্লাহর রাসূলের (সা) একটি সতর্কবাণীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেছিলেন, জাতিসমূহ একদিন মুসলিমদের ওপর হামলে পড়বে, তবে সেটা তাদের সংখ্যায় অল্প হওয়ার কারণে ঘটবে না। বরং তাদের সংখ্যা বিশাল হলেও তা প্রবল জলধারায় বয়ে যাওয়া শুষ্ক খড়কুটার মতোই মূল্যহীন হবে।[২২]

সমস্যাটি নতুন নয় এবং এটি এমনিতেই শেষ হওয়ার মতো নয়। শীতল যুদ্ধ অবসানের পরপরই পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা ইসলামকে পাশ্চাত্যের পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জন্য একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর ১৯৯৩ সালে লিখিত যুগান্তকারী “সভ্যতার সংঘাত”[২৩] প্রবন্ধে ঘোষণা করেছেন, “ইসলামের সীমানাসমূহ রক্তাক্ত।” হান্টিংটন তাঁর এই চিন্তার ঋণ স্বীকার করেছেন ইসলাম-পাশ্চাত্য বিভক্তির দুই শিবিরের লেখকদের কাছেই। তিনি একজন সেক্যুলার ভারতীয় মুসলিমের উদ্ধৃতি দেনঃ “মাগরেব থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামী জাতিসমূহের মধ্য থেকেই নতুন বিশ্বব্যবস্থার সংগ্রাম শুরু হবে।” হান্টিংটন বার্নার্ড লুইসেরও উদ্ধৃতি দেনঃ “এটি সভ্যতার সংঘাত থেকে কম কিছু নয়”যা আমাদের ইহুদী-খ্রিষ্টান ঐতিহ্য, সেক্যুলার বর্তমান এবং এ উভয়ের বিশ্বব্যাপী প্রসারণের বিরুদ্ধে এক প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্ভবত অযৌক্তিক কিন্তু সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া।” লুইস এবং হান্টিংটনের এই মনোভাব ছিল যুদ্ধাংদেহী, অযথার্থ এবং সহানুভূতিশূন্য। কিন্তু সভ্যতার অস্বিত্বকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবতার কিছু উপাদান তাদের চিন্তায় প্রকাশিত হয়।

অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে হাজারো একাডেমিক প্রতিবাদ হলেও তাতে সভ্যতার আলাদা আলাদা অস্তিত্বকে

অস্বীকার করা হয়। ফলে তাদের এই প্রতিবাদ লুইস এবং হান্টিংটনের যুদ্ধাংদেহী চিন্তাকে পরাজিত করতে পারে না। হান্টিংটনের এই প্রবন্ধ বের হওয়ার পর থেকে, মুসলিম সীমান্তসমূহ ক্রমে আরো বেশি রক্তাক্ত হয়েছে। তবে শুধু সীমান্তেই তা সীমাবদ্ধ নেই। সীমান্তের অভ্যন্তরে যে দেহের কথা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন আত্মঘাতী আঘাতের ফলে তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহও অকেজো ও রক্তাক্ত হয়ে পড়ছে। একটি নৃতাত্ত্বিক-ধর্মীয় এবং ঔপনিবেশিক বর্ণবাদী রাষ্ট্রের হাতে ফিলিস্তিন আহত এবং রক্তক্ষরিত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছে। আরেকটি নৃতত্ত্বীয়-ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের হাতে রোহিঙ্গারা জ্বালাও-পোড়াও, ধর্ষণ এবং নিশ্চিহ্নকরণের শিকার। রোহিঙ্গা নারীরা গণহারে তাদের ধর্ষকদের সন্তান জন্ম দিচ্ছে। আবার ওদিকে আরেকটি ধর্ম-অনুপ্রাণিত নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের হাতে কাশ্মীরি ও ভারতীয় মুসলিমরা প্রতিদিন তাদের সম্মান, মানবতা এবং জীবন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চায়নায় উইঘুর মুসলিমদের বিভিন্ন অন্তরীকরণ ক্যাম্পে নির্যাতন ও মগজধোলাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে, যেখানে তাদের পুরুষদের হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের নারীদের হান চাইনিজ পুরুষদের সাথে সহবাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র শক্তভাবে এর কোনো প্রতিবাদ জানায়নি; মুসলিম সড়কগুলোও প্রতিবাদশূন্য। সেক্যুলার মানবাধিকার সংগঠন এবং কৌশলগতভাবে চীনের উত্থানবিরোধী রাষ্ট্রসমূহ বাদ দিলে উল্লেখযোগ্য কোনো শক্ত প্রতিবাদ নেই বললেই চলে। মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রেও মুসলিমরা গণহত্যার শিকার হচ্ছে।[২৪] ইয়েমেন, সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক, সোমালিয়া, সুদান এবং আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধ ও গভীর নৈরাজ্যের শিকার যেটার কোনো সমাপ্তি নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে না।

জীবাশ্ম জ্বালানীর জোরে কাগুজে বাঘ হয়ে বসা সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যকার আঞ্চলিক সংঘাতকে শিয়া-সুন্নীর ফেরকাগত যুদ্ধ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চলছে। নিজেদের ব্যর্থতা থেকে দৃষ্টি সরানোর জন্য বিবাদমান উভয় পক্ষের ক্ষমতাশীল শ্রেণী এমনভাবেই বিষয়টিকে হাজির করছে। এ সংঘাত সহজেই পুরো অঞ্চলকে একটি নৃশংস আঞ্চলিক যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে পারে যা সহজেই বাকি বিশ্বকে এতে টেনে আনবে। ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টির পিছনের সবচেয়ে বড় অন্তরায়গুলোই একই সাথে প্রমাণ করছে যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।

একটি স্বৈরাচারী ধর্মরাষ্ট্র নাকি সহনশীল ইসলামী ইউনিয়ন?

অর্থপূর্ণভাবে খিলাফতের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চাইলে অতীতে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা ও রীতিনীতির বারংবার ব্যর্থ হওয়াকে কথা খোলামনে স্বীকার করে নিতে হবে। একইসাথে বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য একটি প্রামাণ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য রূপকল্প প্রণয়ন করতে হবে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই নতুন রুপকল্পের সাথে অতীতের ব্যর্থ হওয়া প্রকল্পের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করতে পারতে হবে।

এ ধরনের প্রকল্পকে অনৈতিহাসিক বা বাস্তবতা বিবর্জিত ইউটোপিয়ান কিছু হলে যেমন চলবে না, তেমনি তা হতে পারবে না মধ্যযুগের কোনো ব্যবস্থা বা চিন্তার গতানুগতিক অনুকরণ। তাছাড়া এ ধরনের রাজনৈতিক ঐক্যের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে অবশ্যই গুরুত্ব প্রদান এবং তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই বৈচিত্রের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি বিভিন্ন মুসলিম ধর্মীয়গোষ্ঠী ও অমুসলিম

সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রভৃতি নানান বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত। কেবল একটি প্রবন্ধ দিয়ে এই ধরনের প্রকল্পের সঠিক রূপ রেখা তৈরি করা অসম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন মুসলিম আইনবিশেষজ্ঞ, ধর্মতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, উদ্যোক্তা এবং স্বপ্নদর্শী নেতৃবৃন্দের একটি পুরো প্রজন্ম। এখানে আমার উদ্দেশ্য কেবল এই প্রকল্পের ন্যয্যতার পক্ষে বড় দাগে কিছু রূপ রেখা হাজির করা এবং সে ক্ষেত্রে আমি কিছুটা ইতিহাসের সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করেছি।

ভান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির ইহুদীধর্ম ও ইসলামের ওপর বিশেষজ্ঞ ইহুদী প্রফেসর ডেভিড ওয়াসেরস্টেইন সম্প্রতি ISIS এর আদর্শিক ও ধর্মীয় শেকড়ের ওপর Black Banners of ISIS: The Roots of the New Caliphate[২৫] শিরোনামে একটি গবেষণাকর্ম প্রকাশ করেছেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন যেখানে তিনি দেখান কিভাবে মধ্যযুগীয় ইসলাম, প্রাচীন খেলাফতের ইসলামই ইহুদীধর্মকে ধ্বংস হতে রক্ষা করে। ইসলাম ইহুদীজাতিকে রক্ষা করেছে। আধুনিক যুগে এটি একটি অজনপ্রিয়, অস্বস্তিপূর্ণ দাবী বটে। কিন্তু এটি ঐতিহাসিক সত্য। এর পক্ষে যুগল যুক্তি রয়েছে।

প্রথমত, ৫৭০ সালে যখন নবী মুহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহুদী জাতি এবং ইহুদীধর্ম ছিল ধ্বংসপ্রায়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের আগমন নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উদ্ধার করেছে, যে প্রেক্ষাপটে তারা শুধুমাত্র রক্ষাই পায়নি, উন্নতি লাভও করেছে যার ধারাবাহিকতা খ্রিষ্টান বিশ্বেও পরিলক্ষিত হয়। মূলত এই প্রেক্ষাপটই ইহুদি সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করেছে যা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে তার ক্রম পদার্পনে ভূমিকা রেখেছে। যদি ইসলাম না আসতো তাহলে পাশ্চাত্যে ইহুদীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো আর প্রাচ্যে ইহুদীরা অন্যান্য আরো অনেক ছোট ছোট ধর্মীয়গোষ্ঠীর মতো অনুল্লেখযোগ্য ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরিণত হত।[২৬]

এটা ঠিক বোধগম্য না, প্রফেসরের কাছে পরিহাসটি সুস্পষ্ট কিনা। ঐতিহাসিকভাবে খিলাফতই ছিল ইসলামী সভ্যতার অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। যা তার তত্ত্বাবধায়নে আইন, ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মীয় প্রকল্প গঠন করেছে। এই গঠনের নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও (এসিম্পটোট ধারণাটি এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি!) তা খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যকার বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রাণবন্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা করেছে এবং এর তত্ত্বাবধায়নে গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের পুনঃজাগরণ হয়েছে। এসত্যকে স্রেফ স্মৃতিকাতরতা অথবা সময়ের চাকাকে পেছনে ঘোরানো যায় না ইত্যাদি বলে অনেকসময় নাকচ করা হয়। কিন্তু এই অতীত ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে আমাদের উচিত ওয়াসেরস্টেইনের দেয়া দুটো উদাহারণের ওপর আরেকটু তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে।

> খিলাফত দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহকে কয়েক শতাব্দী দীর্ঘ শাসন দ্বারা একইসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। এই সময়ে তুলনামূলকভাবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিদ্যমান ছিল এবং নানান অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক বিনিময় অব্যাহতভাবে চলছিল। যদি খেলাফত না থাকত তবে এই অঞ্চলসমূহের একতা রাসূলুল্লাহ (সা) এর পর যত দ্রুত অর্জিত হয়েছে তত দ্রুতই এর সমাপ্তি ঘটতো। আর বিকল্প হিসেবে দেখা যেত ছোট ছোট রাজ্যসম্বলিত

অন্ধকারযুগ অথবা এর চেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে দেখা যেত খারেজিদের (ISIS কে বিবৃত করতে যথার্য একটি উপমা) মতো দল-উপদলের নেতৃত্বে চলমান গোত্রীয় লড়াই-বিবাদ। উমাইয়া, আব্বাসী অথবা ওসমানী কোনো খলিফাই ত্রুটিমুক্ত ছিলো না, এদের কেউ কেউ তো ছিল পুরোদস্তুর অত্যাচারী; কিন্তু মোটের ওপর তারা এবং মুসলিম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উম্মাহর একতার এবং আইন-শৃঙ্খলার প্রাধান্যতার সর্বোচ্চ গুরুত্বটি বুঝতেন ও এর স্বীকৃতি দিতেন। এটাই সেই আকাঙ্ক্ষিত মুলনীতি যার ব্যাপারে প্রাজ্ঞ মুসলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করতেন। আকাঙ্ক্ষিত এই মূলনীতির উপর আমরা এখন দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো।

অতীতঃ ইতিহাস এবং আদর্শবাদী ঐতিহ্য

ইংরেজিতে “Caliphate” শব্দটি আরবি *খিলাফাহ* শব্দের ইংরেজিকৃত রূপ। এর ত্রি-আক্ষরিক মূল (খা-লাম-ফা) মূলত “ক্রম, সময় বা স্থানের প্রেক্ষিতে কারো পরে বা পিছনে থাকা অথবা আগমন করা” বুঝায়। একজন “খলিফা” বলতে তাই একজন উত্তরসূরীকে বোঝানো হয়, যাকে তার পূর্বসূরী কিছু দায়িত্ব পালন করার জন্য পেছনে রেখে গিয়েছে। কোরআন খলিফা অর্থে আদম এবং তাঁর বংশধরদেরকেই বুঝানো হয়েছে (২:৩০)“যেটাকে প্রথমদিকের মুফাসসিরগণ স্বাভাবিকভাবেই “পৃথিবীতে কর্তৃত্বকারী পূর্ববর্তী একটি সৃষ্টির উত্তরসূরী”-র অর্থে নিয়েছেন। আবার, সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রাসূলের (সা) একটি দোয়া অনুযায়ী, আল্লাহ সেই মুসাফিরের খলিফা, যে তার ঘর এবং পরিবারকে আল্লাহর হেফাজতে রেখে যায়।[২৭] অধুনা সময়ে “খলিফা” শব্দের অনুবাদ করা হয় প্রতিনিধি বা ভারপ্রাপ্ত। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষ আল্লাহর সরাসরি প্রতিনিধি এমন ধারণা বিংশ শতাব্দীতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে কুরআন ও হাদীসে এ শব্দের ব্যবহার লক্ষ করলে এই অনুবাদকে অযথার্থ বলা যায়। কোরআনের আরেক জায়গায় নবী দাউদকে (আ) “জমিনের খলিফা” হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যেটার সরল অর্থ শুধুমাত্র “জমিনের উত্তরাধিকারী” ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এ আয়াতের অনুবাদেও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের অর্থকে আরোপ করতে দেখা যায়। অবশ্য কোরআনে “তাসখীর” ও “তাকরীম” (আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং অন্যসব সৃষ্টিকে তার অধীন করে দিয়েছেন, ১৭:৭০, ১৪:৩২-৩৩ ইত্যাদি) এদিক দিয়ে “খলিফা” শব্দের সাথে খোদায়ী সম্পর্কের ধারণাকে সমর্থন করা যায়, কিন্তু ভাষাগতভাবে “খলিফা” শব্দের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা যে শুধুমাত্র অর্থগত মারপ্যাঁচের ব্যাপার এমনটা নয়, বরং এই ভুল বোঝাবোঝির উপর ভিত্তি করে মুসলিম ও প্রাচ্যবিদদের রচনার একটা পুরো আলাদা ধরন গড়ে উঠেছে।[২৮] কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো এই ভুল অর্থকে ব্যবহার করে জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণাকে কোরআনে আরোপ করা হয়েছে।[২৯]

যাই হোক, মুসলিমদের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতাকে বোঝাতে “খলিফা” শব্দের যে ঐতিহাসিক ব্যবহার সেটাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই অর্থে রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাতের পর তাঁর উম্মাহর নেতৃত্ব ও তত্ত্বধায়নের জন্য তাঁর সহকারীর দায়িত্বকে বোঝাতেই খলিফা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মুসলিমদের এই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতাকে সুন্নী ও শিয়া উভয় দলের ধর্মতাত্ত্বিকরা ইমাম হিসেবেও অভিহিত করেছেন; যদিও শিয়াদের কাছে “ইমাম”

শব্দটি ধর্মীয় দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত নেতার জন্য সীমাবদ্ধ, যার জন্য রাজনৈতিক নেতা হওয়া জরুরী না। একেবারে শুরুর দিকে যেহেতু খলিফা শব্দটির নিখুঁত কোনো রাজনৈতিক অর্থ ছিল না এবং তা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহর (সা) উত্তরসূরী হিসেবে আবু বকরের (রা) ভূমিকাকে বিবৃত করতে ব্যবহৃত হত, দ্বিতীয় খলিফা উমরের (রা) সময় থেকে পরবর্তী খলিফাদের সম্বোধন করার জন্য অধিকতর স্পষ্ট অর্থ সম্পন্ন আমীরুল মু মিনীন পদবীটির ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে পড়ে। সময়ের সাথে যখন রাজনৈতিক ময়দানে আমীর (সামরিক নেতা), সুলতান (কর্তৃপক্ষ, রাজা) এবং মালিক (রাজা)-সহ বিভিন্নরকম নেতৃত্বের সয়লাব ঘটে, তখনই এসে মুসলিমদের একক ও সর্বোচ্চ নেতা বোঝাতে খলিফা শব্দের ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক ব্যবহার স্থিরীকৃত হয়।

খিলাফতের পাঁচটি ঐতিহাসিক মডেল

সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট প্রথম এবং একমাত্র আদর্শিক মডেল রাসূলুল্লাহ (সা) এর চারজন উত্তরসূরী খলিফার খিলাফত, যাদেরকে পরবর্তীতে রাশিদুন (সঠিকপথ প্রাপ্ত) বলা হত। প্রথমদিকে, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে নিয়মতান্ত্রিক আলাদা করা হতো না। খলিফা বা রাসূলের (সা) উত্তরসূরী দুধরনের নেতৃত্বকেই ধারণ করতেন। এর একশো বছরেরও কম সময়ের মধ্যে খিলাফতের আরেক মডেলের উদ্ভব ঘটে যেখানে খিলাফত প্রধানত রাজনৈতিক পদে পরিণত হয় এবং ধর্মীয় নেতৃত্বে ধীরে ধীরে খলিফা এবং উলামা উভয়ের হিস্যা তৈরী হয়। সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের জন্য নিবেদিত একটি উদীয়মান ওলামা শ্রেণীর আবির্ভাব এ সময়ে ঘটে এবং তারা নানা বুদ্ধিভিত্তিক ধারার প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধিত শহুরে মুসলিম অধিবাসীদেরকে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন।

খলিফার ক্ষমতা কার্যতভাবে কখনোই নিরঙ্কুশ ছিল না, কিন্তু উলামাগণ চারশত হিজরী বা এক হাজার খ্রিষ্টাব্দের শুরু থেকেই খলিফার সীমারেখা ও দায়িত্ব তাত্ত্বিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা শুরু করেন। প্রথমদিকের খলিফাগণ সবাই সমান এমন ব্যবস্থার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে (primus inter pares) ছোট শহর মদীনা থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য শাসন করতেন। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল সমানাধিকার, জনগণের সরাসরি সংযোগ এবং ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু এই মডেল দ্বারা দূর-দূরান্ত পর্যত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়ে এই কাঠামো প্রতিস্থাপিত হয় এবং উমাইয়া খেলাফতের শেষ আমল থেকে শুরু করে আব্বাসী খেলাফতের স্বর্ণযুগ পর্যন্ত তা চলতে থাকে। দুইশত হিজরী/খ্রিষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দী থেকে তিন শত হিজরী/খিষ্টাব্দ নবম শতাব্দী পর্যন্ত আব্বাসী খিলাফত তার স্বর্ণযুগ অতিক্রম করেছে এবং এখন পর্যন্ত মাথাপিছু সম্পদের নিরিখে এটিই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং বড় সাম্রাজ্য।[৩০] প্রতিকী দিক দিয়ে এ সাম্রাজ্য ইসলামপূর্ব সাসানিদ ব্যবস্থার কিছু চিহ্ন পর্যন্ত গ্রহণ করেছিল। যেমন যোগ্য সম্রাটকে ঈশ্বরের মতো নিরংকুশ মহিমা প্রদানের চেষ্টা। কিন্তু বাস্তবে ও ইসলামী আইন অনুসারে শাসকদের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল বরং সীমিত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এটা ছিল খিলাফতের দ্বিতীয় মডেল।

যখন সময়ের সাথে সাথে বাগদাদী খলিফাদের প্রকৃত ক্ষমতা কমে আসতে থাকলো, তখন খিলাফতের

তৃতীয় মডেলের উদ্ভব হয়, যেখানে খলিফারা ছিলেন মূলত প্রতীকি এবং রূহানী কর্তৃত্বের অধিকারী। আঞ্চলিক গভর্নর বা আগ্রাসী বিভিন্ন সেনাধিনায়করাই ছিলেন বিভিন্ন প্রদেশের বাস্তব শাসক। এই অবৈধ আক্রমণকারী সেনাধিনায়করা খলিফাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিতেন। এই যুগের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় পাচশো বছর। এই ক্লাসিক্যাল যুগেই ইসলামী আইন, ধর্মতত্ত্ব এবং রাজনৈতিক চিন্তা সুবিধিবদ্ধ হয়। খলিফার এই প্রতীকি ক্ষমতা ছিল অপরিহার্য এবং খলিফার পক্ষে তার প্রকৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারটি খুব বেশি অসম্ভব ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইসলামী বীর সালাহউদ্দীন এর উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাণিধানযোগ্য; তিনি ক্রুসেডারদের হাত থেকে জেরুজালেমকে পুনরুদ্ধার করেন এবং সুবিশাল মহানুভবতা দেখিয়ে সবার মন জয় করে নেন। অথচ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাগদাদের খলিফার স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হন। অর্থাৎ কোনো শাসকের অর্জন যাই হোক না কেন, তার কর্তৃত্ব বৈধ হওয়ার জন্য খলিফার স্বীকৃতি জরুরী ছিল।

মুসলিমদের নিকট এটা ক্রমবর্ধমানভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিলো যে, খলিফা দুটো গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতার প্রতিনিধিত্ব করেনঃ

১) রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সাথে প্রতীকি সিলসিলা স্থাপনকারী, যাঁদের আচার ও কর্ম মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত।

২) মুসলিমদের স্থানিক অবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করা, যার গুরুত্ব বোঝা যাবে তৎকালিন যা আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের নানান সমাজ ও ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলে। এসব সমাজ নানান আঞ্চলিক রাজা ও শাসকের অধীন থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিচালিত হত। খেলাফত ধারণার মধ্য দিয়ে এসব সমাজের মুসলিমরা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই দুই ধরনের ব্যবস্থার ফলে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, ধর্মীয় ফেরকাবাজি এবং সাংস্কৃতিক রেষারেষিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে অঞ্চলগুলো পারস্পারিক যুদ্ধের বর্বরতা ও বিভাজনে প্রতিনিয়ত নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এ সমাজসমূহ ছিল মূলত আঞ্চলিক শাসক ও আলেমদের তদারকিতে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে স্বশাসিত। রাজা কিংবা সুলতানগণ মূলত পরিচালক বা, আরেকটু আলঙ্কারিক উচ্চারণে বললে কার্যনির্বাহী শাখার দায়িত্ব পালন করতেন; তারা প্রতিরক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য জরুরী ছিলেন কিন্তু তাদের উৎখাত করা সম্ভবপর ছিল। তারা এই সুবিশাল মানবগোষ্ঠীর আদর্শ, আইনকানুন অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবর্তন করা ছাড়াই আসতেন এবং যেতেন। এই তৃতীয় মডেলকে বলা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ইসলামী সংবিধানবাদ।[৩১] এই মডেল গুরুত্বের দাবীদার কারণ প্রথম কয়েক শতাব্দী ব্যতীত পুরো ইসলামী ইতিহাস জুড়ে খিলাফত এরকমই ছিল।

অর্থাৎ খেলাফত বেশিরভাগ সময়ই নিঁখুত কিছু ছিল না। আল মাওয়ারদী (মৃত্যুঃ ৪৫০হি/১০৫৮খ্রি), আল জুয়াইনী (মৃত্যুঃ ৪৭৮হি/১০৮৫খ্রি), আল গাজালী (মৃত্যুঃ ৫০৫হি/১১১১খ্রি), ইবনে তাইমিয়ার (মৃত্যুঃ ৭২৮হি/১৩২৮খ্রি) মতো সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক চিন্তাশীল আলেমগণের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। তারা সামরিক দখলদার শাসকদের সামনে খলিফার ক্ষমতাহীনতাকে নীতিগত দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির বিবেচনায় এটাকে একরকম বৈধতা দিয়েছিলেন। আল গাজালী (রহ.) তাঁর সময়কার সালজুক সুলতানদের মেনে নেয়াকে মৃত জন্তুর গোশত

খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন, যা শুধুমাত্র হালাল খাদ্য না পাওয়া গেলেই জায়েজ। এই সুলতানরা আব্বাসী খলিফার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে নামমাত্র স্বীকার করে নিলেও বাস্তবে তা অবজ্ঞা করে চলতো। পরবর্তীতে আমরা দেখবো কিভাবে অন্যরাও, বিশেষ করে ইবনে তাইমিয়া (রহ.), আল গাজালীর সাথে এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। এই তৃতীয় মডেলের প্রথমার্ধে অর্থাৎ মোঙ্গল আক্রমণের (৬৫৬ হি/ ১২৫৮ খ্রি) আগ পর্যন্ত বাগদাদ ভিত্তিক আব্বাসীয় খলিফাদের প্রতীকি ক্ষমতা বেশ গুরুত্ব বহন করত। পরবর্তীতে মামলুক আমলে আব্বাসী খেলাফত কায়রোয় স্থানান্তরিত হয় এবং খলিফা তার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু তখনো শাসনকার্যে বৈধতার প্রশ্নে খলিফার অনুমোদন অপরিহার্য ছিল। ফলে দিল্লী এবং তিম্বুকতুর মতো দূরবর্তী মুসলিম অঞ্চলগুলোতে কে বৈধ শাসক এবং কে ক্ষমতার অবৈধ দখলদার তা ঠিক করতে খলিফার অনুমোদন পত্র নির্ধারক ভূমিকা পালন করত।

খিলাফতের চতুর্থ মডেলটি ছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় মডেলের সংমিশ্রন। এ মডেলের উত্থান ঘটে যখন ওসমানীরা পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম আফ্রিকা এবং উত্তর আফ্রিকাকে একই সাম্রাজ্যের অধীনে রাজনৈতিকভাবে একত্রিত করে। এই সাম্রাজ্য তৎকালীন সময়ের অন্যতম সফল, স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে প্রায় চারশো বছর টিকে ছিল।

ওসমানী সুলতানগণ (যারা কায়রোর মামলুকদের পরাজিত করার পর খলিফা পদবী ধারণ করেন) শরীয়াহ আইনের অধীনেই শাসনব্যবস্থা চালাতে থাকেন, যেটার ব্যাখ্যা ও তদারকি মুফতী ও কাজী হিসেবে আলেমরাই করতেন। তাই খলিফা-সুলতানদের ক্ষমতা ছিল সীমিত। আমাদের সামনে এমন সুলতানেরও উদাহারণ আছে যাকে প্রধান কাজীর রায় অনুযায়ী অপসারণ করা হয়েছে। অবশ্য এতকিছুর পরে ও সুলতানরা তাদের স্বার্থের প্রশ্নে কখনো কখনো ক্ষমতার জোরে স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারতেন, তবে সেটা ইসলামকে ব্যবহার করে নয় বরং প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রীতি-নীতির বিরুদ্ধে যেয়ে করতে হত। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় শাসনরত ওসমানী এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে শাসনরত মোঘলদের সাথে তাদের শিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী সাফাভীদের তুলনা করা যেতে পারে। উসমানী ও মোঘলদের বিপরীতে সাফাভিরা রাজনৈতিক বৈধতার প্রশ্নকে কড়া ধর্মতান্ত্রিক দাবির উপরে দাঁড় করিয়েছিল। ওসমানী খিলাফতের দাবীকে অবশ্য কখনো কখনো আধ্যাত্মিকতার চাদরে মোড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আনাতোলীয় সূফীবাদ ওসমানী খলিফাদের সমস্ত মুসলিমদের শাসক, রূহানী পথপ্রদর্শক ও আইনপ্রণয়নকারী হিসেবে চিত্রিত করতে সাহায্য করেছে। তবে তিনটি সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যকে একই রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিচে একত্রিত করার কোনো রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। এই প্রচেষ্টা নেয়াটাও হয়তো কল্পনাতীত ছিল।[৩২]

শেষের তিন মডেলের খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ দিক ছিল এই যে, খলিফা কিছু সীমিত জনসাধারণ সম্পর্কিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও ধর্মীয় কর্তৃত্ব দেখাতে পারতো না। ওসমানীদের কথাই ধরা যাক, সূফীরা ওসমানী খলিফাদের পৃথিবীতে খোদার ছায়া হিসেবে কল্পনা করতে পারতো, এমনকি আধ্যাত্মিকতার বেশে তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং তাদের বিভিন্ন কর্মনীতিকে হয়তো ন্যায্যতাপ্রদানও করা হতো, কিন্তু এসব দাবীসমূহ যাতে সূফী খানকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সেটা নিশ্চিত করতেন সাম্রাজ্যের মেরুদন্ড হিসেবে বিবেচিত হানাফী ফিক্বহের ধারকবাহকগণ। এমনকি বার্নারড লুইসের মতো আক্রমণাত্মক চিন্তার অধিকারি নব্য-রক্ষণশীল ব্যক্তিও এর স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রাচ্যবাদি চিন্তা ও গবেষণার এই প্রধান পুরুষ এতটুকু অন্তত স্বীকার করেছেন যে, (সুন্নী)

ইসলামে কখনো পুরোহিততন্ত্র ছিল না এবং থাকতেও পারে না। এর আসল কারণ সুন্নী ফিক্বহে অন্তর্নিহিত জ্ঞানকান্ডিক বহুত্ববাদ এবং এতে মধ্যযুগীয় চার্চের মতো খোদার মুখপাত্র হিসেবে কোনো সংস্থার অনুপস্থিতি। কোরআন ও সুন্নাহ এবং ঐতিহ্যের ব্যাখ্যায় বহুমতের উপস্থিতির তাৎপর্য ছিল দুটিঃ

প্রথমতঃ ধর্মীয় কর্তৃত্ব ছিল বিভক্ত ও তাতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক স্বরের উপস্থিতি।

দ্বিতীয়তঃ শাসকগোষ্ঠী এর ফলে কখনোই ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এর ফলে, একটি ভারসাম্য পূর্ণ ও পারস্পারিক সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ধর্মীয়-সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

তৃতীয় ও চতুর্থ মডেলের খিলাফত যুক্তভাবে প্রায় এক হাজার বছর টিকে ছিল এবং সেগুলো না পুরোহিততান্ত্রিক ছিল, আর না স্বৈরতান্ত্রিক। তারা তাদের শাসনাধীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বেশ প্রশস্তমাত্রার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিলঃ বিভিন্ন মাযহাবের মুসলিম, ইহুদী, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে স্বাধীনভাবেই বসবাস করতো। যদিও এই ব্যবস্থা এর পূর্ণাঙ্গরূপ থেকে অনেক দূরে ছিল কিন্তু এরপরেও তা বিভিন্ন আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র ও এমনকি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতেও অধিকতর কার্যকরভাবে একটি ন্যায়বান ও খোদা-কেন্দ্রিক জীবনযাপনের জন্য অনুকূল ছিল।

তখন সম্প্রদায় ও সম্প্রদায় কেন্দ্রীক মূল্যবোধকে যেকোনো শালীন জীবনযাপনের জন্য জরুরী ভাবা হতো, যেটা আধুনিক উদারনৈতিক ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। তাই অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারতো। ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক অধিকারের যে বাটখারা তা প্রায়শঃ দ্বিতীয়টির দিকেই নুয়ে পড়ত। গ্রীকদের বিপরীতে ওসমানীয়রা রোমানদের মতোই ছিল প্রশাসক ও প্রতিষ্ঠান নির্মাতা গোছের। তারা কোরআনের রক্ষিত সম্প্রদায়, যিম্মী-র ধারণাকে একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন; রাজধানীতে এই সম্প্রদায়গুলোর প্রতিনিধিত্ব করতেন তাদের নিজ নিজ নেতৃবৃন্দ। এ ব্যবস্থাকে 'মিল্লেত' ব্যবস্থা বলা হত।[৩৩] উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রগুলো প্রথমবারের মতো ওসমানীয়দের সমপর্যায়ে উঠে এলো এবং খুব দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির দিক দিয়ে ওসমানীয়দের ছাড়িয়ে গেল। এ পরিস্থতিওসমানীয়রা দ্রুতই সামলে ওঠে এবং তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যেই নিজেদের সামরিক বাহিনী, অর্থনীতি এবং সমাজ আধুনিকায়নে লম্বা পথ অতিক্রমে সক্ষম হয়। নতুন পরিস্থিতিতেও সুলতানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধই থাকে। পূর্বের পদ্ধতিতে ক্ষমতা সীমিতকরণের উৎস ছিল সুসমন্বিত সামজিক ও সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা। নতুন পদ্ধতিতে সেটা প্রতিস্থাপিত হয় সংবিধান দ্বারা। তবে ওসমানীয়রা তাদের এই নতুন ব্যবস্থা সহ টিকে থাকতে পারেনি কারণ তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে যায়। পূর্বের প্রচলিত ধারণা হলওসমানীয়রা ইউরোপের রুগ্ন মানব। অর্থাৎ তাদের সামগ্রিক ভগ্নদশাগ্রস্থ অবস্থা তাদের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই ধারণাকে নাকচ করে দেন। বরং তাদের মতে ওসমানীয়রা যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অন্য পক্ষে অংশ নিতো কিংবা কোনোভাবে টিকে যেতো, তবে ওসমানীয়রা তাদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হত। আমরা এই ক্ষণস্থায়ী সাংবিধানিক খিলাফতকে খিলাফতের পঞ্চম সম্ভাব্য মডেল বলতে পারি।

খেলাফতের তত্ত্ব

খিলাফতের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ থেকে এর মূলসত্ত্বাকে পৃথক করার জন্য সুন্নী আলেমগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে খিলাফতের তত্ত্বায়ন করেছে। তাঁরা একইসাথে খিলাফতে রাশেদার মডেলের প্রতি অনুগত থেকে এবং খিলাফতের রূপান্তরের ব্যাপারটিও মাথায় রেখে এর দায়িত্ব, কাজ, প্রকৃতি এবং সীমার তাত্ত্বিক বুনিয়াদ স্থাপন করেন। এটি ছিল একটি দুরুহ চর্চা ও গবেষণার কাজ। এ বিষয়ে যা যা মতভেদ কল্পনা করা সম্ভব ছিল তার সবই হয়েছে। সামনের সারির ফুক্বাহা এবং মুতাকাল্লিমগণ এ বিষয়ে যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণাদির পাহাড় গড়ে তুলেছেন এবং খুবই সতর্কতার সাথে এসব প্রমাণাদির মূল্যায়ন-পুনঃমূল্যায়ন করেছেন। এটা মোটেই অবাক করা ব্যাপার নয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের সতর্ক তত্ত্বায়ন হয়েছে পঞ্চম শতক হিজরী/একাদশ শতক খ্রিষ্টাব্দের আলেমগণ দ্বারা, যখন খিলাফতের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন ছিল। ইসলামের প্রথম দুই শতাব্দীতে উম্মাহর একতা ও অস্তিত্বের জন্য খিলাফতের জরুরত এত বেশি ছিল যে, সেই সময়কালে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার পুঙ্খনাপুঙ্খ তাত্ত্বিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করাটা বাহুল্য ছিল। এরপরেও আমরা উমাইয়া খিলাফতের একজন সচিব, আবদুল হামিদ আল কাতিবের (মৃত্যু ১৩২ হিজরী/৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) একটি চিঠি খুঁজে পাই, যেটি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম পুরনো সংরক্ষিত চিঠিগুলোর একটি। এ চিঠিতে তিনি খোদানির্দেশিত এবং রাসূলের মিশনের ধারাবাহিকতা রক্ষাকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে খেলাফতের তত্ত্বায়ন কিংবা ন্যয্যতা প্রতিপাদন সম্ভব কিনা তা নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন।[৩৪]

এখন পর্যন্ত টিকে আছে এমনসব মুসলিম মাযহাবই মুসলিম উম্মাহর জন্য একজন সর্বোচ্চ নেতা নির্ধারণ করার ফরযিয়াতের ব্যাপারে একমত। সুন্নী ও শিয়ারা এই ব্যাপারে একমত কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির ব্যাপারে তাদের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। ইমামী শিয়ারা তো ইমামে বিশ্বাসকে ঈমানের একটি ভিত্তি এবং ইমাম প্রেরণকে আল্লাহর ওপর ওয়াজিব (লুতফ বা খোদায়ী অনুগ্রহ) হিসেবে গণ্য করেছে। এই ইমাম অবশ্যই আলীর (রা) বংশধরদের মধ্য থেকে হবেন। এর অর্থ এই যে, একজন প্রকৃত ইমামকে জানা ও বিশ্বাস করা (যদিও তিনি ক্ষমতাসীন বা অস্তিত্বে না থাকেন) সমস্ত মানুষের ওপর বাধ্যতামূলক।[৩৫] যায়েদী শিয়ারাও আলীর (রা) বংশধরদের জন্য শাসনাধিকার নির্দিষ্ট করে কিন্তু খলিফা হওয়ার যোগ্য তিনিই যিনি সফলভাবে অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে পারবেন।

অন্যদিকে সুন্নীরা খিলাফত প্রতিষ্ঠাকে সম্মিলিত কর্তব্য হিসেবে গণ্য করে। পার্থক্যটা সূক্ষ্ম। শিয়াদের জন্য যথার্থ ইমামে বিশ্বাস না করাটা গোমরাহী, কখনো কখনো ঈমান ভঙ্গের কারণও। সুন্নীদের জন্য যথার্থ ইমাম নির্বাচন অথবা এর জন্য প্রচেষ্টা চালাতে ব্যর্থ হওয়া গুনাহর শামিল। নরমপন্থী এবং বিকাশকালীন সময়কাল পেরিয়ে টিকে থাকা একমাত্র খারেজী ফেরকা, ইবাদীরাও ন্যায়বান ইমাম/খলিফায় বিশ্বাস করে, তবে শিয়া ও বেশিরভাগ সুন্নীদের বিপরীতে এবং ওসমানী শাসন সূচনা পরবর্তী বেশিরভাগ সুন্নীদের মতো তারা খলিফা হওয়ার জন্য কুরাইশ বা অন্য বংশোদ্ভূত হওয়াকে শর্ত মনে করে না।[৩৬]

খলিফা ছাড়া ইসলামী জীবনযাপন সম্ভব কিনা এ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। গাজালীর মতো কেউ কেউ তো এরকম পরিস্থিতিতে ইসলামী জীবনের বৈধতাই অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে তাঁর শিক্ষক আবুল মা'আল আল জুওয়াইনী, যিনি তাঁর সময়ের শীর্ষ মুতাকাল্লিম এবং শাফি'ঈ ফক্বীহ ছিলেন, তাঁর অসাধারণ ও কল্পনাশক্তিপূর্ণ বই 'গিয়াছ আল উমাম ফি আল তিয়াছ আয যুলাম'[৩৭] বইতে এরকম

পরিস্থিতি কল্পনা করেছেন। তিনি এই বইতে একটি ডিস্টোপীয় ভবিষ্যত কল্পনা করেছেন যখন যোগ্য কোনো খলিফা অথবা কোনো খলিফাই থাকবে না। এ পরিস্থিতিতে আলেমরাই থেকে যাবে উম্মাহকে পথপ্রদর্শনের জন্য এবং অবশেষে এমনকি হয়তো কোনো যোগ্য আলেমও থাকবে না, এ অবস্থায় মুসলিমদের কী করণীয় এ নিয়েও এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল জুওয়াইনী কিছু পরোক্ষ আয়াত ও একক রেওয়ায়েত বিশিষ্ট হাদীছ উল্লেখ করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, তিনি জোর দিয়ে বলেন, যেহেতু খিলাফতের চূড়ান্ত ফরযিয়্যাতের ব্যাপারটি প্রমাণের জন্য চাই সন্দেহাতীত দলিল, তাই এই বিষয়টি সাহাবাদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে, যা দ্বীনের যেকোনো ফরজিয়্যাত প্রমাণে সর্বোচ্চ দলিল হিসেবে গণ্য।[৩৮] এরপর তিনি যুক্তি দেখান, অসংখ্য যুক্তিশীল মানুষ এমন একটি প্রশ্নের একটি উত্তরে একমত হতে পারে না, যে প্রশ্নের একাধিক উত্তর সম্ভব, যতক্ষণ না এর পিছে একটি কারণ বিদ্যমান। খিলাফতের ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমার ক্ষেত্রে এই কারণটি হচ্ছে কোরআন ও রাসূলের (সা) শিক্ষার ব্যাপারে অভিন্ন বুঝ। তাই এই ইজমা না আকস্মিক ছিল, আর না প্রয়োজনের খাতিরে এই ইজমার জন্ম। বনু সায়েদার চত্বরের সমাবেশে মদীনা আনসারদের মধ্যে প্রারম্ভিক মতভেদ হয়, পরবর্তীতে বিচার-বিতর্কের অবসান হয় এবং সাহাবাগণ এই ইজমায় উপনীত হন। এই ইজমার বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা আবু বকর ও উমর (রা) শুরুতেই বুঝেছিলেন ও অন্যান্য সাহাবারাও পরবর্তীতে তাঁদের দুজনের সাথে একমত হন।

> এসব কিছুই প্রমাণ করে যে, খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ইসলামের প্রশ্নাতীত ফরজিয়্যাতগুলো দ্বারাই নির্ধারিত। মঙ্গল আক্রমণ পরবর্তী যুগে (সপ্তম শতক হিজরী/ত্রয়োদশ শতাব্দী খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে) প্রথম দিকে সঙ্কটাবস্থা ও নিরাপত্তাহীনতা কাটানোর স্বার্থে প্রয়োগিক দিক বিবেচনায় কর্তৃত্ববাদি শাসকদের বৈধতা প্রদানের একটা রীতি তৈরি হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে শর্ত ছিল উম্মাহ বা তার কিছু অংশকে হলেও রক্ষা করতে সক্ষম হতে হবে। মঙ্গল আক্রমণ পরবর্তী যুগে (সপ্তম শতক হিজরী/ত্রয়োদশ শতাব্দী খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে) এই রীতি নির্বিচারে যেকোনো জবরদখলকারি শাসকের ন্যয্যতা প্রদানের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ইবনে খালদুন ও ইবনে তাইমিয়ার মতো এই যুগের সবচেয়ে মৌলিক লেখকরা খিলাফতের ফরজিয়্যাতকে পুনরায় তুলে ধরেন, সেইসাথে তারা রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিক সংযোজনও করেন।

ইবনে খালদুন রাজনৈতিক ক্ষমতার সামাজিক, বস্তুগত এবং মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর তত্ত্বায়ন করেন এবং ইতিহাস ও রাজনীতির ব্যাপারে একটি তত্ত্ব দাঁড় করান। আরো কয়েক শতক পর আধুনিক যুগে এসেই এ ধরনের চিন্তার প্রচলন হয়।

ইবনে তাইমিয়া খিলাফতের ফরজিয়্যাত নিয়ে প্রশ্ন উঠান নি, কিন্তু মঙ্গল আগ্রাসন পরবর্তী খিলাফতের চূড়ান্ত অকার্যকারিতাকে স্বীকার করে নেন। তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে উম্মাহকে পুনরিজ্জীবিত করবার জন্য একটি আরোহী রাজনৈতিক মডেল পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন, যেখানে শরীয়ার বাস্তবায়নই হবে শাসকের বৈধতার কেন্দ্রীয় মাত্রা। মোঙ্গলদের বাগদাদ ধ্বংসের আগে, খিলাফতকে একদিকে একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হত যেখানে শরীয়ার

ব্যাপারে আলোচনা তার গঠন ও পুনর্গঠন সম্ভব ছিল; অন্যদিকে এটাকে দাবি করা হত রাসূল (সঃ) এর সিলসিলা ধরে অব্যাহতভাবে চালু থাকা একটি ব্যবস্থা। মিলিতভাবে এই দুই দিক খিলাফতের যেকোনো কেতাবী ন্যায্যতা প্রতিপাদন থেকে অনেক শক্তিশালী ছিলঃ অর্থাৎ খেলাফত সমাজে শরীয়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবকারী প্রতিষ্ঠান, ফলে তা শরীয়ার চেয়ে বড় কিছু।। আল-মাওয়ার্দী ও আল-গাজালীর মতো আলেমরা তখনই কেবল খিলাফতের জন্য দলিল পেশ করা শুরু করেন যখন তাঁরা খিলাফত ব্যবস্থাকে হুমকির সম্মুখীন বলে অনুভব করলেন। মোঙ্গল আগ্রাসন পরবর্তী পৃথিবীতে খেলাফত অকার্যকর হয়ে পড়ায় শরীয়াকে সর্বত্র ইসলামী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার পেছনে মূল প্রেরণাদায়ি শক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়। যথার্থ খেলাফত ফিরবার আগ পর্যন্ত অনেকটা আপৎকালিন ব্যবস্থা হিসেবে এটাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই ধরনের ইসলামী রাজনীতির পক্ষে শুধুমাত্র প্রাথমিক যুক্তিগুলো প্রদান করেন; পরবর্তীতে অন্য মাযহাবের আলেমগণ বিশেষকরে ওসমানীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা শরীয়া রাজনীতির এই সহজাত বিকাশকে স্বীকৃতি দেন।[৩৯]

ওপরে যে দাবী করা হয়েছে সেগুলোকে তথ্য-উপাদান দিয়ে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের খিলাফতের ব্যাপারে দাবী ও তাদের দ্বারা এই সংস্থার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের একটি নমুনা দেখা যাক। যাহেরী স্কুলের প্রখ্যাত স্কলার ইবনে হাযম (রহ.) (মৃত্যুঃ ৪৫৬ হিজরী/১০৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) আব্বাসী খিলাফত শাসিত মুসলিমদের মূলভূমির বাইরে স্পেনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বলেনঃ

> সমস্ত আহলে সুন্নাহ, মুরজিয়া, শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায় মুসলিমদের ওপর ইমামত প্রতিষ্ঠা এবং একজন ন্যায়বিচারক ইমামের আনুগত্য করার ফরযিয়্যাতের ব্যাপারে একমত, যিনি আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সা) আনীত আইন প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা দ্বারা মানুষকে শাসন করেন। এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে খারেজীদের নজদি উপদলটি, যারা বলে, মুসলিমদের ওপর ইমাম থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তাদের দায়িত্ব কেবল পরস্পরের প্রতি প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা।[৪০]

ইবনে হাযম এখানে মুসলিমদের দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের (৬০-৭০ হিজরী) সময়কার খারেজী ও কিছু মুতাযিলা চরমপন্থীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যারা এই বিরোধকালিন সময়ে খিলাফত ফরয কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। ফরজিয়্যাত কিন্তু এরপর হাদীছের প্রামাণ্যতা, কিয়াসের বৈধতা, শেষ দুই খলিফায়ে রাশেদের ন্যায়পরায়ণতা এবং মুসলিম জীবনের অলঙ্ঘনীয়তার মতো মৌলিক তত্ত্বগুলোর ব্যাপারেও তারা প্রশ্ন তোলা শুরু করে। এরকম একজন মুক্তচিন্তক অনেকটা বাস্তবতা বিবর্জিতভাবে দাবি করেন, সব মু মিন যদি স্বেচ্ছায় খোদায়ী আইন অনুযায়ী জীবনযাপন করে সেক্ষেত্রে কোনো শাসনব্যবস্থারই প্রয়োজন হবে না। খেয়াল করার বিষয় যে, এখানে বিকল্প হিসেবে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার প্রস্তাবনা দেয়া হয়নি, বরং শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। অন্য আরেক চিন্তক প্রায় অতিবাস্তবিতার আশ্রয় নিয়ে যুক্তি দেখান, ইমাম না থাকার অবস্থা কেবল গৃহযুদ্ধের সময়েই হতে পারে, তাই গৃহযুদ্ধের সময় কোনো ইমামের প্রতি আনুগত্য না থাকাটাই জরুরী।[৪১] তবে সামগ্রিকভাবে, খলিফার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে মোটামোটি সবাই একমত ছিলেন। এবং এই ঐক্যমতের মাত্রা বর্তমানে ধরে নেয়া অনেক মৌলিক বিষয়ের তুলনায় অধিক ছিল।

সামনের সারির হানাফী মাতুরিদী আলেম আবু হাফস আন-নাসাফী (রহ.) (মৃত্যুঃ ৫৩৭ হিজরী/১১৪২ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর □আল-আক্বাইদ আন নাসাফীয়া□ গ্রন্থে বলেনঃ □মুসলিমদের নিজেদের শাসন বাস্তবায়ন, হুদুদ প্রতিষ্ঠা এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য একজন ইমাম থাকা বাধ্যতামূলক□□ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইরানী বহুশাস্ত্রজ্ঞ এবং আশা□আরী মুতাকাল্লিম আল-তাফতাযানী (মৃত্যুঃ ৭৯২ হিজরী/১৩৯০ খ্রিষ্টাব্দ) লেখেনঃ

> □এ ব্যাপারে ইজমা আছে যে, একজন ইমাম নিযুক্ত করা ফরয, কিন্তু যে বিষয়ে মতভিন্নতা আছে সেটা হচ্ছে এই ইমাম কি আল্লাহ নিজেই নিযুক্ত করেন নাকি সৃষ্ট জীব হিসেবে মানুষ তার আকলের উপর নির্ভর করে নিজেরা একজনকে নিযুক্ত করবে। এই ফরয কি নাযিলকৃত দলিল দ্বারা সাব্যস্ত নাকি আক্বলী দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। আমাদের মাযহাবের মত হচ্ছে, এটি নাযিলকৃত দলিলের মাধ্যমে সৃষ্টির ওপর ফরজিয়্যাত আকারে এই দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। যেমন কিনা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে তাঁর সময়ের ইমামকে না চিনে মারা যায়, তার মৃত্যু জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু।"[৪২] এজন্যই উম্মাহ নবীর (সা) দাফনের আগেই ইমাম নিযুক্ত করাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এমনটাই হওয়া উচিত প্রত্যেক ইমামের মৃত্যুর পর, কেননা অনেক শরয়ী দায়িত্বপালন ইমামের ওপর নির্ভরশীল।□[৪৩]

তাঁর সময়কালে মিশর ও সিরিয়ার মতো ইসলামের কেন্দ্রভূমিসমূহ মামলুকদের শাসনাধীনের ছিল এবং পূর্বাংশ (ইরান এবং মাওয়ারান নহর) তৈমুর লং এর আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলো। এ পরিস্থিতির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে তাফতাযানী ব্যাখ্যা করেন কেন সব মুসলিম অঞ্চলের জন্য একক শাসক প্রয়োজনঃ

> □অনেক সময় এ প্রশ্ন করা হয় যে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা শাসক থাকালে অসুবিধা কোথায়? সব অঞ্চলের উপর সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন নেতার বাধ্যবাধকতা ঠিক কোথায়? প্রশ্ন (আর-রিয়াসা আল-আম্মা)□ আমাদের উত্তর হবে কারণ তেমনটা (প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একজন করে শাসক নিয়োগ) করলে তা সংঘাত ও শত্রুতার জন্ম দেবে, যার ফলে দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়াবলীতে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে, যেমনটি কিনা আমরা আমাদের সময়ে প্রত্যক্ষ করছি।□[৪৪]

এরপর তিনি প্রথাগত কালামী পন্থায় প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কেন তুর্কীদের মতো (সম্ভবত তিনি তৈমুর লং এর দিকে ইঙ্গিত করছিলেন) তৎকালীন যুদ্ধজয়ীরা এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয় এবং কেনই-বা একজন ইমামই প্রয়োজন? তিনি নিজেই এর উওরে বলেন, এরকম একজন (তুর্কী) শাসক সমস্ত মুসলিম অঞ্চলসমূহের শাসক নিযুক্ত হলে, কিছু দায়িত্ব হাসিল হয়ে যাবে ঠিক, তবে দ্বীনি সংক্রান্ত বিষয়গুলো ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অথচ দ্বীনি উদ্দেশ্য হাসিল করা অন্য সকল লক্ষ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ববাহি।□[৪৫]

একই সময়ে ইসলামী বিশ্বের পশ্চিম অংশে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও মালিকি ফক্বীহ ইবনে খালদুন (মৃত্যুঃ ৮০৮ হি/১৪০৬ খ্রি) এই বিষয়ে ইজমাকে সংক্ষেপে তুলে ধরেনঃ

একজন শাসক নিযুক্ত করা ফরয। এর ফরজিয়্যাত নাযিলকৃত অধ্যাদেশ এবং সাহাবাদের ও তাবেয়ীদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। এর কারণ, নবীর (সা) সাহাবারা তাঁর মৃত্যুর পর খুব দ্রুত আবু বকরকে (সা) বাইয়াত দিয়ে তাঁর ওপর শাসনভার অর্পণ করেন। এর পর থেকে প্রত্যেক যুগে এমনটাই হয়ে এসেছে এবং এই ব্যাপারে ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা নেতা নির্ধারণের ফরযিয়্যাতের দিকে ইঙ্গিত করে।[৪৬] এরপর ইবনে খালদুন তাঁর আশআরী মত অনুযায়ী যুক্তি দেখান, কিভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফরজিয়্যাত (অন্য সকল ফরযের মতো) নাযিলকৃত অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রমাণিত, আক্বলের মাধ্যমে নয়। তাই আক্বলী যুক্তি দ্বারা এই ফরয রদ হতে পারে না।

ইবনে খালদুন খেলাফত ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন এমনটি বললে অনেক কম বলা হবে। বরং তিনি তাঁর সেরা গ্রন্থটিতে খিলাফতের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন এবং একে ফিরিয়ে আনার জন্য শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। ইসলামী সভ্যতার ওপর পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ হ্যামিল্টন গিব যুক্তি দেখান, ইবনে খালদুনের চিন্তার কেন্দ্রে অবস্থান করছে খিলাফতের বিষয়টি, যা আন্দাজ করা যায় তাঁর বইয়ের অধ্যায়ের বিন্যাস দেখে, যেগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, সেগুলো খিলাফত বিষয়ক অধ্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়, এরপর সেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত সংগঠন বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন, এরপর কোনো রাষ্ট্রের ক্রমক্ষয় ও চূড়ান্ত পতন নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর লেখায় তিনি তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্রমবিবর্তন ও গোত্রীয় সংহতি বিশ্লেষণ করেছেন। এর পাশাপাশি তার আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি তাঁর সময়ের অন্যান্য মুসলিম ফক্বীহদের মতো শরীয়ার আদর্শ ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে কিভাবে একটা সামঞ্জস্যবিধান করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।[৪৭]

একইভাবে মু'তাযিলা, শিয়া কিংবা ইবনে তাইমিয়ার মতো ঐতিহ্যাবাদি সবাই খিলাফতকে অন্যান্য ফরজের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ মনে করতেন। এবং এই ফরজফরজিয়্যাত, নাযিলকৃত অধ্যাদেশ ও আক্বল উভয় উপায়েই সাব্যস্ত করা যায়।[৪৮]

আলেমগণ শাসনব্যবস্থার অপরিহার্যতা প্রমাণে অনেক কারণ দেখিয়েছেন এবং সরকারের অনেক দরকারি কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের কারো কারো মতে, এই কার্যাবলিই খিলাফতের ফরযিয়্যাতের কারণ অথবা কারণের অংশ; আবার কারো কারো মতে, এইগুলো খিলাফত থাকার উপকারিতা মাত্র। কিন্তু খেলাফত ফরজ হওয়ার জন্য এই উপকারিতার উপস্থিতি অপরিহার্য নয়।

আল-মাওয়ারদী এবং আল গাজালী খেলাফতকে আচারিক জায়গা থেকে ফরজ মনে করতেন। তাদের মতে খিলাফতের কার্যকারিতা থাকুক বা না থাকুক, এবং খলিফা যদি অন্যদের ক্ষমতার উপর নির্ভশীলও হন তবু খেলাফত থাকাটা গুরত্বপূর্ণ। তারা আরো মনে করতেন যে, ইসলামী জীবনযাপনের বৈধতা খেলাফত থাকার উপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে আল-জুওয়াইনী ও ইবনে তাইমিয়াহ খেলাফতের ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় এটাকে ফরজ মনে করতেন। তাদের মতে হুদুদ কায়েম, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং উম্মাহ ও দ্বীনের প্রতিরক্ষা করা খলিফা হওয়ার অপরিহার্য অংশ।

আলেমগণ এখন পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে খিলাফতের ব্যাপারে এই ধারার যুক্তিই দিয়ে আসছেন। একাদশ হিজরী শতক/সপ্তদশ খ্রিষ্টাব্দ শতকের একজন দামেস্কীয় ফক্বীহ তাঁর রচিত হানাফী ফিক্বহের ওপর একটি প্রামাণ্য মুখতাসার গ্রন্থে বলেনঃ

> সর্বোচ্চ ইমামত হচ্ছে জনসাধারণের উপর একটি সার্বিক শাসনাধিকার থাকা। সাধারণভাবে শাসন করার অধিকার। ধর্মতাত্ত্বিক জায়গায় এটা নিয়ে ইলমে কালামে বিস্তারিত গবেষণা করা এবং বাস্তবে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করা সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ফরয। এজন্যই তাঁরা (সাহাবাগণ) ইমাম নিযুক্ত করাকে মুজিজা সম্পন্ন নবী (সঃ)-কে দাফন করার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪৯]

খিলাফত ইসলামী আক্বীদায় কেন এতটা মুখ্য?

এর কারণ ত্রিত্ত্ববাদকে সংজ্ঞায়িতকরণ যেমন খ্রিষ্টানধর্মের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, ইসলামে খিলাফতের ব্যাপারটিও তাই। তাত্ত্বিকভাবে উম্মাহর যথার্থ নেতৃত্ব নির্ধারণ করতে পারার উপরে ইসলামের সঠিক আকিদা নির্ণয় করতে পারা নির্ভর করছিল। একদম শুরুর দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী উপদলগুলি খোদায়ী বিধান প্রতিষ্ঠা করবার ক্ষেত্রে উম্মাহর মূলধারার ন্যায়পরায়ণতা ও যোগ্যতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছিল। অথচ উম্মাহর মূলধারাই কোরআন ও নবীর (সা) সুন্নাহর সংরক্ষণাবেক্ষণ করেছে। সুতরাং উম্মাহর এই মূলধারার ন্যায়পরায়ণতাকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে পারাটা তাত্ত্বিক আলাপের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। আর এই আলাপকে ঘিরেই ইসলামের প্রথম দুই শতকে ইসলামী চিন্তার একটি বড় অংশ গড়ে উঠেছে।[৫০] মুসলিমদের রাজনৈতিক ঐক্য ধরে রাখার ব্যাপারে সাহাবীদের মতৈক্যের প্রথম ঘটনাটি আবু বকরের (রা) নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছিল। এটা আরো দৃঢ় হয় মদীনার কর্তৃত্ব থেকে যারা আলাদা হতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মতির মাধ্যমে। সাহাবাগণ স্রেফ তাত্ত্বিক মত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, এর ওপর ভিত্তি করে অস্ত্রও তুলে নেন। এর মাধ্যমে তাঁরা উম্মাহকে ত্যাগকারী বা একে বিভক্তকারীদের প্রতি রাসূলের (সা) আচরণকেই অনুসরণ করেছেন।[৫১] সাহাবাদের এই প্রাথমিক মতৈক্য পরবর্তীকালে বারবার পুনঃব্যক্ত হয়েছে। এর পরবর্তী সুস্পষ্ট উদাহারণ হচ্ছে আলীর (রা) [যাঁর ঘাটি ছিল ইরাকে] সিফফীনের যুদ্ধে মুয়াবিয়ার (রা) [যাঁর ঘাটি ছিল সিরিয়ায়] মুখোমুখি হওয়া। আলী (রা) কখনোই রক্তপাত এড়ানোর খাতিরে মতানৈক্যের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলার চিন্তাকে আশ্রয় দেননি। বাস্তবে এজন্য প্রচুর রক্তপাত হয়েছিলও বটে। একইভাবে মক্কায় অবস্থানকৃত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা) সিরীয় উমাইয়াদের মোকাবেলা করেন। কিন্তু তখনও শান্তির খাতিরে উম্মাহর বিভক্তিকরণ কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেসময় ইবনে উমর (রা) এবং অন্যান্য সামনের সারির প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ইবনে যুবাইরকে বাইয়াত দিতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ হিসেবে তাঁরা ঠিক এই যুক্তিটাই দেখান যে, উম্মাহ তখনো ইবনে যুবাইরের (আ) অধীনে একতাবদ্ধ হয়নি।[৫২]

খিলাফতের কার্যাবলির ব্যাপারে ক্লাসিক্যাল সুন্নী আলেমগণের দৃষ্টিভঙ্গী ইমাম আলীর (রা) সাথে সম্পর্কিত একটি উক্তির মাধ্যমে ফুটে ওঠে। তাঁর সেনাবাহিনীতে থাকা কিছু চরমপন্থী যখন সিরীয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নেতা হিসেবে তাঁর একটি সালিশির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললো, তখন তিনি উম্মাহকে শাসনের জন্য একজন মানবীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর

দিয়ে বলেনঃ

> “আলী বলেন, ‘জনগণের ওপর অবশ্যই একটি নেতৃত্ব থাকতে হবে, সেটা আল্লাহভীরু হোক বা ফাসেক।’ তারা বললো, ‘হে আমীরুল মু’মিনীন, আল্লাহভীরু শাসকের কথা তো বুঝলাম, কিন্তু ফাসেক নেতৃত্ব কেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘এর মাধ্যমেও হুদুদ প্রতিষ্ঠিত হবে, জনসড়কগুলো নিরাপদ থাকবে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ জারী থাকবে এবং গনীমতের বন্টন হবে।’”[৫৩]

যদি শাসনব্যবস্থা সাধারণভাবে একটি যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা হয়, তাহলে খিলাফতকে একটি যথার্থ ইসলামী শাসনব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়। একটি তুলনা দিলে বুঝতে সহায়ক হবে; যেমন, বিয়ের কথাই ধরা যাক, পারষ্পারিক সঙ্গ প্রদান করা ও পুনরুৎপাদনের জন্য পুরুষ ও নারীর জোড় গঠনই হইল বিয়ে। সব মানব সংস্কৃতিতেই কমবেশি এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রয়েছে। এর সাথে যোগ হয় নিজ নিজ সংস্কৃতি অনুযায়ী বিয়ের ফলে সৃষ্ট সীমা, অনুষ্ঠান, রীতি এবং মঙ্গলকামনা। ইসলামী বিয়েও প্রাথমিক কার্যাবলির দিকে দিয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন কিছু নয়, কিন্তু অন্য সংস্কৃতিতে উপস্থিত সহবাসের অনেক রূপই ইসলামে নিষিদ্ধ এবং ইসলামী বিয়েতে উপস্থিত অতিরিক্ত কিছু বাধ্যবাধকতা, রীতিনীতি এবং আইনী ধারা একে পৃথক ইসলামী রূপ প্রদান করে। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) সিয়াসা আস-শারইয়্যাহতে এর ব্যাখ্যা করেন এভাবেঃ

> “এটা অবশ্যই জানা থাকা প্রয়োজন যে, জনগণের ওপর শাসনব্যবস্থা থাকা দ্বীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরযগুলোর অন্যতম এবং দ্বীন এটা ছাড়া ক্বায়েম হতে পারে না। কেননা পরস্পরের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য একতাবদ্ধ হওয়া ছাড়া আদমের সন্তানদের কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে না। এজন্য জিহাদ, ন্যায়বিচার, হজ্জ্ব কায়েম, জুম’আর জামায়াত, ঈদ উৎসব, মজলুমদের সাহায্য করা এবং আল্লাহর দেয়া হুদুদ কায়েম করার মতো ফরয কাজগুলোর জন্য শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকাটা জরুরী।”[৫৪] যে জিনিসটি প্রথমত ও সর্বাগ্রে খিলাফতকে অন্যান্য শাসনব্যবস্থা থেকে আলাদা করে তা হচ্ছে এর মৌলিক নীতি ও প্রাথমিক গঠনমালা। (এর উৎস, সীমা, উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি)।

খিলাফতের ওপর সুস্পষ্ট ক্লাসিক্যাল কাজ করেছেন আল-মাওয়ার্দী, যিনি বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ও তৎকালীন অন্যতম প্রধান শাফি’ঈ আলেম ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি খলিফার প্রামাণ্য সংজ্ঞা প্রদান করেনঃ একজন খলিফা হচ্ছে “রাসূলের উত্তরসূরী যিনি দ্বীনকে রক্ষা করেন এবং এর মাধ্যমে উম্মাহর দুনিয়াবী বিষয়াদির দেখাশোনা ও শাসন করেন।”[৫৫]

খিলাফতের প্রায় সব সংজ্ঞাতেই এই উপাদানসমূহের উল্লেখ আছেঃ

ক) খলিফা নবীর (সা) স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু তিনি নবী বা নিষ্পাপ নন এবং পুরো মুসলিম উম্মাহর আনুগত্যপ্রাপ্ত।

খ) নবীর (সা) উম্মাহর দ্বীনি ও বৈষয়িক বিষয়াদি খলিফার শাসনাধীন, যার অর্থ তিনি দ্বীনের হেফাজত করেন, সীমান্তের প্রতিরক্ষা করেন, আইন-শৃঙ্খলা জারী রাখেন এবং সম্পদ বন্টন করেন।

অন্য কথায়, খলিফাকে নবীর (সা) পুরো উম্মাহর প্রধান হিসেবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়। কোনো একটি ভূ-অঞ্চল বা দেশের শাসন কর্তা কিংবা কোনো একটি উপদল অথবা বাছাইকৃত একদল মুসলিমের প্রধান হলেই তাকে ঠিক খলিফা বলা যাবে না।[৫৬]

খেলাফত রাজতন্ত্র নয়

একদম শুরু থেকেই মুসলিমরা যথার্থ ইসলামী শাসনব্যবস্থা এবং সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য করতো। প্রথমটিকে তারা "খিলাফা" বলতো, আর পরেরটিকে বলতো মুল্ক। এটা লক্ষ্যণীয় যে, আরবিতে "মুল্ক-এর দুটি অর্থ আছেঃ এই শব্দ যেকোনো রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতে পারে, যার একটি রূপ হচ্ছে ইসলামী খিলাফত। আবার এই শব্দ দ্বারা নিন্দনীয় অর্থে এমন কোনো রাজতন্ত্রকেও বোঝানো যেতে পারে, যেটাতে শাসক তাঁর ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারের মাধ্যমে তার অধীনে থাকা জনগণ ও সম্পদকে নিজস্ব সম্পত্তি মনে করতে থাকে। শুরুর দিকের মুসলিমগণ নিজেদের শাসকদের ক্ষেত্রে "মালিক" (রাজা) শব্দটি ব্যবহার করা এড়িয়ে যেতেন, কারণ তাঁরা এই শব্দের অন্তর্নিহিত অসাম্যতার ধারণাকে ঘৃণা করতেন।[৫৭] এ বিষয়ে বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে সাহাবী জারির বিন আবদুল্লাহ (রা) ইয়েমেনের এক প্রজ্ঞাবান লোকের বক্তব্য উল্লেখ করেনঃ

"তোমরা আরবরা তোমাদের নেতার মৃত্যুর পর যতদিন পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবে, ততদিন কল্যাণের ওপর থাকবে, কেননা তলোয়ারের মাধ্যমে নেতৃত্ব দখলকারীরা সম্রাটে (মুলুক) পরিণত হয়। তাদের ক্রোধ অন্যান্য সম্রাটদের মতো এবং তাদের আনন্দও অন্যান্য সম্রাটদের মতোই।"[৫৮]

পুরো মধ্যযুগেই এই পার্থক্য কার্যকর ছিল। মালিকী আলেম আল-মাক্কাররি আল-তিলিমসানী এ ব্যাপারে একটি চমৎকার মন্তব্য করেন। কিছু সূফী সাধক মুসলিম সমাজের সম্রাটদের ন্যায়নীতিহীনতা ও আল্লাহর ভয় না থাকার ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করেন। মুসলিমদের এমন দুর্ভাগ্যের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> "এর কারণ রাজতন্ত্র (মুল্ক) আমাদের শরীয়াহতে নেই। এটা আমাদের পূর্ববতীদের শরীয়াহতে আছে। আর এর প্রমাণ হলো আল্লাহ বনী ইসরাইলীদের ওপর তাঁর নেয়ামত বর্ণনার সময় এর উল্লেখ করেছেন।"তিনি [আল্লাহ] আমাদের জন্য খিলাফা ছাড়া আর কিছুই জায়েজ করেননি।"[৫৯]

আল মাক্কাররি এরপর রাজতন্ত্র ও খিলাফতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যকীকরণ করেছেন। এক্ষেত্রে তার ভিত্তি হলো একজন শাসক তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করেন কিনা এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেটিকে পরিবারতান্ত্রিকভাবে তার পুত্রসন্তানদের কাছে হস্তান্তর করে যান কিনা। খিলাফত ব্যবস্থায় উম্মাহর স্বার্থকে সামনে ও কেন্দ্রে রাখা হয় এবং শাসনকর্তৃত্বকে আমানত হিসেবে দেখা হয়। এটাই

খিলাফতকে রাজতন্ত্র থেকে আলাদা করে।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তো এ ব্যাপারে আরো স্পষ্টভাষী ছিলেন; তার মতে, রাজতন্ত্র দিয়ে ফরজিয়্যাত পূরণ হয় না যদিও সমস্ত মুসলিমদের ওপর শুধুমাত্র একজন সম্রাটই কর্তৃত্বশীল থাকেন। বরং ফরয হচ্ছে একজন খলিফাকে নিযুক্ত করা, যিনি তাঁর দায়িত্বের জন্য জবাবদিহিতা করবেন, নিজের ইচ্ছাখুশিমতো নয় বরং রাসূলুল্লাহ (সা) এবং প্রথম দিককার খলিফাগণের পদক্ষেপ অনুসরণ করতঃ ক্ষমতাকে আমানত মনে করবেনঃ

> □প্রশ্ন হচ্ছে, রাজতন্ত্র (মুল্‌ক) কি বৈধ? এবং সেক্ষত্রে নবুওয়াতী খিলাফত কি কেবলই অপেক্ষাকৃত উত্তম বিকল্প? নাকি রাজতন্ত্র অবৈধ? এবং সে ক্ষেত্রে এটা কেবল তখনই বৈধ হতে পারে যখন এ সংক্রান্ত জ্ঞান (যে খিলাফত বাধ্যতামূলক) ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা অনুপস্থিত থাকে?
>
> আমাদের মতে, রাজতন্ত্র মৌলিকভাবেই অবৈধ এবং ফরয হচ্ছে নবুওয়াতী খিলাফত প্রতিষ্ঠা, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, □আমার পরে তোমরা অবশ্যই আমার এবং খলিফায়ে রাশেদার সুন্নতকে অনুসরণ করবে। একে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। (অন্যায্য) বিদা□আত থেকে দূরে থাকবে এবং মনে রাখবে, এরকম প্রত্যেক বিদা□আতই ভ্রান্তি।□□এই হাদীছ আমাদের জন্য নির্দেশনা, এতে আমাদেরকে আমাদের (নবুওয়াতী) খলিফাদের সুন্নতকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তা থেকে বিচ্যুতি হতে আমাদের সাবধান করা হয়েছে। এটা রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ, যা খিলাফত প্রতিষ্ঠাকে আমাদের ওপর কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত করে□নবী (সা) যেহেতু নবুওয়াতী খিলাফতের পরে আসা রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর অপছন্দ ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাজতন্ত্রে এমন কিছুর অভাব আছে যা দ্বীনে বাধ্যতামূলক□যারা রাজতন্ত্রকে জায়েজ সাব্যস্ত করতে চান তারা মুয়াবিয়াকে (রা) বলা নবীর (সা) এই কথার দিকে ইঙ্গিত করেনঃ □তুমি যদি সম্রাট হও, তবে ভালো ও সদয় আচরণ করবে।□[৬০] কিন্তু এই হাদীছ দ্বারা কোনো অকাট্য দলিল সাব্যস্ত হয় না□□খিলাফত প্রতিষ্ঠা একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতেই এর থেকে বিচ্যুতি জায়েজ হতে পারে।□[৬১]

অপুরণীয় ক্ষতি

বিংশ শতাব্দী পর্যন্তও খিলাফতের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা একটি প্রশ্নাতীত বিষয় ছিল। একশো বছরের ধর্মনিরপেক্ষকরণ ও পশ্চিমায়নের পরিণতিতে বিংশ শতাব্দীতে এসে তুর্কী জাতীয়তাবাদীরা ওসমানী খিলাফত বিলুপ্ত করার যুক্তি দেখাতে থাকে এবং অন্তত অভিজাত শ্রেণীর নিকট তা আকর্ষণীয় হিসেবে গৃহীত হয়। এই পরিবর্তনের ধারায় একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ছিল এক ওসমানী আধুনিকপন্থী আলেম, সাইয়্যেদ বের দেয়া বক্তব্য। ১৯২৪ সালে তুর্কীশ গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলীতে দেয়া সাতঘন্টাব্যাপী এ বক্তব্যে , তিনি একটি তুর্কী প্রজাতন্ত্র গঠনের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন। আর দুঃখজনকভাবে এর ভিত্তি

তিনি ইসলামে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন।[৬২] এর পরবর্তী দশকগুলোতে কামালপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আগ্রাসীভাবে সবক্ষেত্রে ইসলামকে নির্বাসিত করতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষকরণ কিংবা সমাজ থেকে ইসলামের উচ্ছেদের প্রকল্প অবশ্যই সাইয়্যেদ বের চিন্তায় ছিল না, তবে স্বৈরশাসকদের দ্বারা ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া এবং পরবর্তীতে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার এই উদাহরণ এটাই প্রথম বা শেষ নয়। কামাল আতাতুর্ক এরপর যা করেন তা আর বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। শুধু এটা বলাই যথেষ্ট যে, তার কর্মকান্ড হিটলার ও মুসোলিনীর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৬৩]

খিলাফত বিলুপ্তি ও রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালি তাত্ত্বিক বক্তব্যটি এসেছে মিশরী আযহারী আলেম আলি আবদুর রাযিকের (১৮৮৮-১৯৬৬) কাছ থেকে। তিনি আল-ইসলাম ওয়া উসূলুল হুকম (ইসলাম ও শাসনের মূলনীতি, ১৯২৫) শিরোনামে একটি বই লেখেন, যেখানে তিনি যুক্তি দেখানঃ ইসলাম ব্যক্তি পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি ধর্ম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর উত্তরসূরীদের (খলিফাগণ) রাজনৈতিক কার্যাবলি আকস্মিক বাস্তবতা দিয়ে প্রভাবিত ছিল। ফলে এর সঙ্গে দ্বীন হিসেবে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আব্দুর রাযিক অক্সফোর্ডে দুই বছর কাটান। অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সেখানকার পড়াশোনা সংক্ষিপ্ত করে ফিরে আসতে হয়। তাঁর পরিবার ওয়াফদ পার্টি থেকে ভেঙ্গে বের হওয়া হিযব আল-আহরার আল-দুসতুরিয়্যাহ দলটি গঠনে মৌলিক ভূমিকা পালন করে (ওয়াফদ পার্টি ছিল সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী উপনিবেশ-বিরোধী একটি দল। কিন্তু হিযব আল আহরারের আরো গভীর সেক্যুলার এজেন্ডা ছিল, যেহেতু দলটি পশ্চিমা দেশগুলোর অনুসরণের ওকালতী করতো)। আলী আবদুর রাযিক নিজেও একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং ১৯২৩-২৪ এর পার্লামেন্টারী নির্বাচনে দলের টিকেট নিয়ে একটি আসনে প্রার্থী হন, কিন্তু জিততে ব্যর্থ হন।[৬৪] তিনি কেবল আলেম হিসেবে লেখেন নি, একজন রাজনীতিবিদের এজেন্ডা নিয়েও লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এ বইকে অনেকে গতানুগতিক মূলধারার বাইরের কৃতিত্বপূর্ণ চিন্তা হিসেবে দেখতে শুরু করেন। মূলতঃ ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা তাড়িত হয়ে অনেকে এর মধ্যে রূহানী গভীরতা খুঁজে পেয়েছে। তিনি তার বইতে নবীর (সা) মিশন এবং পরবর্তী খলিফাদের জীবনীকে যেভাবে পাঠ করেছেন তা অনৈতিহাসিক এবং তার নিজের চিন্তাকে একরকম জোর করে চাপিয়ে দেয়া বৈ কিছুই নয়। একইসাথে তার আধুনিকতা সম্পর্কে বোঝা-পড়াও বেশ অগভীর। আযহারী সম্প্রদায় তার এই বইয়ের সমালোচনা করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তার আযহার-সম্পৃক্তিকে বাতিল ঘোষণা করে। মুসলিম বিশ্বের বড় বড় আলেমগণও তার বইয়ের অসংখ্য বিস্তারিত খন্ডন রচনা করে।[৬৫] আলী আবদুর রাযিকের এই বিতর্কিত বইটি বড় বড় আলেমদের খেলাফত ধারণার দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করে। ফলে এ ধারণাটি রক্ষার পক্ষে তারা চিন্তা ও সময় ব্যয় করেন। মূলত আধুনিক সময়ে আলেমদের ইজমার সবচেয়ে নিকটবর্তী উদাহরণ হল এই খেলাফত। তবে কোনো যুক্তির শক্তি অনেকসময় এর তাত্ত্বিক অকাট্যতার ওপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে সময়োপযোগিতার উপরও।

আলী আবদুর রাযিকের তত্ত্ব সেদিক বিবেচনায় তৎকালীন আরব জাতীয়তাবাদী ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের এজেন্ডা শক্তিশালী করতে প্রভূত সহায়তা করেছে।

নবী (সা) কি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

আলী আবদুর রাযিকের যুক্তির ভিত্তি ছিল এই যে, নবীর (সা) বাণী ধর্মীয় ও রূহানী প্রকৃতির ছিল, রাজনৈতিক প্রকৃতির নয়। তিনি প্রমাণ হিসেবে বলেন, কোরআন বা সুন্নাহ কোনোটাই খিলাফতের আদেশ দেয়নি।[৬৬] তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে, কোরআনে কোনো কিছুর নাম উল্লেখ না থাকাটা তার ফরজ হওয়া বা না হওয়ার পক্ষে কোনো শক্তিশালী দলিল নয়। ফরজিয়্যাত কোরআনে তো দৈনিক সালাতের রাকা'আত সংখ্যাও নেই, নেই রাসূল যে শহরে জন্মগ্রহণ বা কবরস্থ হয়েছিলেন সে শহরের ভৌগলিক স্থানাঙ্কও। এসব জ্ঞান সাহাবা এবং তৎপরবর্তী প্রজন্মের রেওয়ায়েতের মাধ্যমেই এসেছে। আলেমগণ যুক্তি দেখিয়েছেন, কোরআন বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে (যাদেরকে কোরআন ঈমানদার অথবা উম্মাহ হিসেবে সম্বোধন করেছে) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশ দিয়েছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন শাসকের অধীনে একতাবদ্ধ থাকতে। এছাড়াও কোরআনে অনেক সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও আইনী নির্দেশনা এসেছে যেগুলোর বাস্তবায়ন কেবলমাত্র একটি স্বাধীন ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই হওয়া সম্ভব। সুরা নিসার ৫৯ আয়াতের মতো (আনুগত্য করো তোমাদের উপর দায়িত্বপ্রাপ্তদের)[৬৭] অনেক আয়াত দিয়ে আল্লাহ এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ নির্দেশনা জারি করেছেন। তেমনি অনেক পরোক্ষ নির্দেশনা ও রয়েছে এ ব্যাপারে যেমনঃ

১) স্বতন্ত্র উম্মাহ হওয়ার আদেশ, যার সদস্যদের বহিরাগতদের সাথে আপোষ-রফামূলক সন্ধি করতে নিষেধ করা হয়েছে,

২) একটি সার্বভৌম সম্প্রদায় হিসেবে যুদ্ধ, শান্তি ও রাজনৈতিক চুক্তি করার নির্দেশ,

৩) আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন না মানার নির্দেশ, যার জন্য উম্মাহকে আইনগতভাবে সার্বভৌম হতে হবে,

৪) ফৌজদারী, বৈবাহিক ও সামাজিক, বাণিজ্যিক, আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সমষ্টিগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা,

৫) একটি স্বতন্ত্র বৈদেশিক নীতি; নবী (সা) প্রতিবেশী সার্বভৌম শাসক ও সম্রাটদের কাছে পত্র প্রেরণ করেছেন (যার অর্থ তাঁর উত্তরসূরীদের ওপরও এই কাজ জারী রাখা ফরয), আবার তালহা, মুসায়লামার মতো মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার ও ইসলামের প্রবেশের পর[৬৮] যেসব গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সামরিক অভিযান পাঠিয়েছেন। এমনকি তার ওফাতের ঠিক আগেও তিনি রোমান সীমান্তের কাছে শাস্তিমূলক সামরিক অভিযান পর্যন্ত পাঠিয়েছেন।

এসব কিছুর জন্য সন্দেহাতীতভাবে দরকার ছিল রাসূলের (সা) উম্মাহর একটি সার্বভৌম রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে সংগঠিত হওয়ার এবং সহিংসতার মাধ্যমের উপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েম না করলেও কমপক্ষে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার। উপরোল্লিখিত ঘটনাসমূহ তর্কাতীতভাবে ঐতিহাসিক সত্য, যেটা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের (সা) উত্তরসূরীরা তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করতঃ তাঁর এই কর্মপন্থাকেই পরবর্তীতে জারী রাখে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে, সাহাবাগণ এবং তাঁদের পর উমাইয়ারা যদি নবীর (সা) রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রম অব্যাহত না রাখতো, তাহলে ইসলাম ইতিহাসে বিস্মৃত একটি গোত্রীয় কাহিনীতে পরিণত হতো। খিলাফতের ব্যাপারে সুন্নাহ আরো অনেক বেশী স্পষ্ট। বহু হাদীসে নবীর (সা) উত্তরসূরীদের আনুগত্য করার ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে, যেমনটা

কিনা উপরোল্লিখিত ইবনে তাইমিয়াহর উক্তিতে উল্লেখ আছে। আলী আবদুর রাযিক এ ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন যে, তাঁর চিন্তাগুলোকে বড় বড় আলেমগণ আগেই সুবিস্তারিতভাবে খন্ডন করেছেন। আল-জুয়াইনী একজন আশ□আরী আলেম ছিলেন, যিনি একক হাদীসকে (আহাদ) নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতেন না, এর জন্য মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতের ওপর নির্ভর করতেন। তিনি ইতিমধ্যে উল্লেখিত বইটি রচনা করেন যেখানে তিনি খিলাফতের জরুরতের পক্ষে তর্কাতীত দলিল পেশ করেন। অন্যদিকে ইবনে তাইমিয়া মুতাওয়াতিরের চেয়ে কিছুটা কম শক্তিশালী হাদিস ও আকলের কার্যকারিতার পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। তিনি অত্যান্ত জোরালোভাবে দেখান যে, এ দুটো নিশ্চিত জ্ঞানে পৌছার মাধ্যম হতে পারে যা ধর্মীয় ফরজিয়্যাত নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। অতঃপর তিনিও বহু সহীহ হাদীস, ইজমা ও আকলী দলিল ব্যবহার করে ইমাম জুয়াইনির মতো একই সিদ্ধান্তে পৌছান। আল জুয়াইনী যা প্রমাণ করেছেন সেই একই জিনিস প্রমাণ করতে।[৬৯]

আবদুর রাযিক চূড়ান্ত ভুলটি করেছিলেন প্রত্যয়গত (conceptual) জায়গায় এসে। তিনি ইউরোপে থাকাকালীন সময়ে আধুনিক সময়ের ধর্ম-বনাম-রাজনীতি□এই দ্বৈততা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এটা না জেনেই যে, এই দ্বৈততা খুবই সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়াও তিনি সেখানকার স্বৈরশাসকদের নিজেদের পতন ঠেকাতে ধর্মকে ব্যবহার করার প্রবণতা দ্বারা ক্ষুব্ধ ছিলেন আর সেটাকে তিনি ইসলামের ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের উপর আরোপ করেন। যারা পশ্চিমা সেক্যুলারিজম দিয়ে প্রভাবিত নন, এমন যেকারো কাছে কোরআন ও সুন্নাহর কিছু নির্দেশনাকে □ধর্মীয়□ আর কিছু নির্দেশনাকে □ধর্মনিরপেক্ষ□ ঘোষণা দেয়া একতরফা ও অন্যায্য মনে হবে।

খিলাফতের ধারণার ওপর আবদুর রাযিকের এই আক্রমণের শক্তির জায়গা হলো, তিনি ভালো করেই জানতেন তিনি কী করছেন। তিনি যে শুধুমাত্র খিলাফতের ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহর দলীল ও ঐতিহ্যবাহী আলোচনাকেই অগ্রাহ্য করেছেন তা নয়, রিদ্দার যুদ্ধের জন্য আবু বকর (রা) ও অন্যান্য সাহাবাদেরকেও তিনি আক্রমণ করেন। এই রিদ্দার যুদ্ধ ছিল আরবের ওপর মদীনার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সংহত করার প্রথম ধাপ। আবদুর রাযিকের মতে, সাহাবারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আবু বকরের সাথে একত্রিত হয়ে ধর্মের নামে ভালো কিছু মুসলিম গোত্রের ওপর দুনিয়াবী যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন, যারা মদীনার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে চেয়েছিলো।[৭০] বুঝে হোক বা না বুঝে, আবদুর রাযিক শুধুমাত্র ইজমাকেই নয়, রাসূলের (সা) নিকটতম সাহাবাদের চারিত্রিক সততাকেও কালিমালিপ্ত করতে রাজি ছিলেন। এই সাহাবীদের চারিত্রিক সততাকে কোরআনেও নিশ্চিত করা হয়েছে এবং যাঁদের ইজমা স্বয়ং কোরআন সংরক্ষণের একমাত্র নিশ্চয়তা। এই দুটো ব্যাপার একইসাথে মিলেই ইসলামের ভিত্তি।

খেলাফতের জন্য আকুলতা

খিলাফত ধারণাটি মুসলিমদের মধ্যে তীব্রভাবে একতা ও ঐতিহাসিক পরম্পরার বোধকে মূর্ত করে তোলে। খেলাফতের পতন তাই মুসলিমদের তীব্রভাবে আঘাত করেছিল। এই আঘাত শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুভুত হয়েছে তা নয়। বরং সাংস্কৃতিক ও একান্ত আবেগের জায়গায়ও তা মুসলিমদের নাড়া দিয়েছিল। ইসলামিক স্টাডিজের বিশেষজ্ঞ মোনা হাসান এই অনুভূতির এক সমৃদ্ধ বর্ণনা তুলে ধরেছেন দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে সামনে রেখে।[৭১] ৬৫৬হিজরী/১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলদের দ্বারা বাগদাদ

ধ্বংসযজ্ঞের সময় এবং এর প্রায় সাতশো বছর পর ১৯২৪ সালে ওসমানী খিলাফত বিলুপ্ত করার সময় এই অনুভূতির তীব্রতা তার লেখায় সঠিকভাবে ধরা পড়ে।[৭১]

বহু সংখ্যক ইসলামী পন্ডিত, রাজনৈতিক কর্মী এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলন গত শতাব্দীতে মুসলিমদের একতার ধারণাকে জিইয়ে রেখেছে। এসব দলের বেশিরভাগই খিলাফতের প্রত্যবর্তনকে তাদের কর্মকাণ্ডের পরোক্ষ ফসল বলে বিবেচনা করে। তবে খুব কম দলই আছে যারা এটাকে নিজেদের সরাসরি লক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। প্যালেস্টাইন-জর্ডানে জন্ম নেয়া হিযবুত তাহরীর এবং দক্ষিণ এশিয়ায় জন্ম নেয়া তানযীমে ইসলাম এমন দুটো আন্তর্জাতিক দল যাদের কার্যক্রম মূলত খিলাফতের পুনরুজ্জীবনের জন্য নিবেদিত। খিলাফত বলতে তারা কেবল মুসলিম সমাজের সংস্কার এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অর্জিত ফলাফলকে নির্দেশ করে না। বরং এটাকে তারা চূড়ান্ত রাজনৈতিক গন্তব্য বানানোর পাশাপাশি লক্ষ অর্জনের উপায় হিসেবেও কল্পনা করে। ফলে খেলাফতকে তারা আকাঙ্খিত সার্বিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা ও মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত হুমকি দূরীকরণের একটি উপকরণও মনে করে থাকে।[৭২] বিংশ শতাব্দী জুড়ে মুসলিম দেশসমূহের উদ্যোগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বৃহত্তর প্যান-ইসলামীয় সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণে কাজ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী উন্নয়নকেন্দ্রীক যুগে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সাথে টেক্কা দিয়ে এক্ষেত্রে কোনো গুরুতর প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।[৭৩] কিন্তু বর্তমানে এই আকাঙ্ক্ষা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।[৭৪] পূর্বোল্লিখিত অরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলো প্যান ইসলামের ধারণাকে জিইয়ে রাখতে আরো বেশি সফল হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মুসলিম ব্রাদারহুড (আরবভাষী দেশগুলোতে) এবং জামায়াতে ইসলামীর (দক্ষিণ এশিয়ায়) মতো ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কারমূলক সংগঠনসমূহ, যারা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে দূরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছে, এটাকে কখনো তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য বানায় নি। শুধুমাত্র ইজরাইলের ফিলিস্তিনে দখলদারিত্বের মতো সংকটময় সময়কালেই প্যান-ইসলামী অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। জাতিকেন্দ্রিকতার যুগে (১৯৪০-১৯৮০) বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন জনগণের সমর্থনে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করেছে।

তারা বেশিরভাগ সময়ে ব্যর্থ হয়েছে। আরও; ইরান ও সুদানের মতো কিছু স্থানে সফল হলেও তা জাতি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা্ এবং এর ভেতরকার অন্তর্নিহিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আদর্শকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি। বরং এসকল রাষ্ট্র নীপিড়ন, দুর্নীতি এবং আঞ্চলিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের সামনে মাথানত করেছে। মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্রব্যবস্থার শেকড় কখনো গভীরে যেতে পারেনি এবং ইসলামপন্থা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে সফল হলেও তার দেয়া প্রতিশ্রুতি সে পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। মোটামোটি সবাই খিলাফতের ধারণাকে মূলতবি করে রেখে দিয়েছে। গণতন্ত্র ও প্রগতি অর্জনের পরই কেবল তা নিয়ে চিন্তা করা হবে, এমন ভাবনাই এর মধ্য দিয়ে উঠে আসছে।[৭৫]

বর্তমান ব্যর্থ রাষ্ট্রসমূহঃ

আরব বিদ্রোহের (১৯১৬-১৯১৮) মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া রাজনৈতিক অবৈধতা ও অস্থিতিশীলতা এক শতাব্দীকাল অতিক্রম করেছে। এর স্থায়ীত্বকাল আরো কত লম্বা হবে সেটা বলা

মুশকিল। বর্তমানে এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা বেড়েই চলছে। সাম্প্রতিককালের একজন ইতিহাসবিদ ওসমানী খিলাফতের পতনের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান দুর্যোগের সংযোগ দেখিয়ে বলেনঃ

"এই অঞ্চলের সম্ভাবনার ব্যাপারে নিরাশা পোষণ করাই যৌক্তিক। এর একটা সমস্যারও স্বল্পমেয়াদী কোনো সমাধান নেই।"[৭৬]

ইতিহাসবিদ ডেভিড ফ্রমকিন তাঁর বই 'A Peace to End All Peace'-এ অনেকটা একই রকমের মন্তব্য করেন। এ অঞ্চলে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের বিভক্তিকরণ নীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে এবং এর পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

> "১৯২২ সালে কৃত নিষ্পত্তি কিংবা যেসব মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে এই নিষ্পত্তি করা হয়েছে, স্থানীয়ভাবে তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা চলমান রয়েছে। ধর্ম কিংবা অন্যকিছুর ভিত্তিতে চলতে থাকা এই বিরোধিতাই এই অঞ্চলের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। আর তা হলো মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক বৈধতার কোনো অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ রাজনীতির নিয়মকানুন সম্পর্কে নেই কোনো ঐক্যমত্য। এবং কোনো দেশের সীমা কতটুকু হবে কিংবা কে কোনো অঞ্চলের শাসক হিসেবে নিজেকে দাবী করতে পারবে তার ব্যাপারে কোনো সার্বজনীন বোঝা-পড়া তৈরি হয়নি। সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে, ওসমানী সুলতানদের কোনো স্থায়ী উত্তরসুরী এখনও কোথাও তৈরি হয়নি।"[৭৭]

গত শতাব্দীর যে কোনো সময়ের চাইতে বর্তমানে মুসলিম জাতিরাষ্ট্রগুলোর ভবিষ্যত অধিকতর অনিশ্চিত। একজন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য অনুযায়ী এটাকে অসম্ভব বিষয় (impossibility) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই অনিশ্চয়তা বা অসম্ভব্যতার অন্তত একটি কারণ হচ্ছে আদর্শিক আর তা হলো ইসলাম।[৭৮] মুসলিম সমাজগুলোতে ইসলামের গভীর শেকড় থাকার কারণে বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বয়ান দিয়ে বৈধতার ভিত্তি নির্মাণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; এই বিকল্প বয়ান জাতীয়তাবাদী, আঞ্চলিক, বাম আন্তর্জাতিকতাবাদ, বা অন্য যা কিছুরই বয়ান হোক না কেন তা কাজে আসেনি। নাযিহ আইয়ুবী নামক এক আরব বিশেষজ্ঞ ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত তার প্রভাবশালী বই 'Overstating the Arab State'-এ বিংশ শতাব্দীর উপনিবেশবাদ পরবর্তী আরব রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী নয় বরং ভয়ংকর হিসেবে বর্ণিত করেছেন অর্থাৎ তারা দুর্বল, অবৈধ এবং তাই হিংস্র।[৭৯] যেহেতু এসব রাষ্ট্র জনগণের বড় অংশের আনুগত্য লাভ করে না (শুধুমাত্র তাদের থেকে স্বার্থ হাসিল করা অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্য লাভ করে), তাই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের পাশবিক শক্তিপ্রয়োগ করতে হয়। এর পাশাপাশি বৈধতাপ্রাপ্তির জন্য জন্য নানা অপ্রাসাঙ্গিক অজুহাত হাজির করতে হয়, যেমন আঞ্চলিক হুমকি ও শত্রুতার অজুহাতর ইজরাইল, যায়োনবাদী, ক্রুসেডার, শিয়া, সুন্নী ইত্যাদি)। সেইসাথে ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক বিভক্তিকে উসকে দিয়ে তার ফায়দাও নিতে হয়। নাসেরের নেতৃত্বাধীন আরব জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতা ও ১৯৬৭-র যুদ্ধে ইজরাইলের হাতে আরব সেনাবাহিনীর অবিস্মরণীয় হেনস্থার সাথে সাথে আরব শাসক শ্রেণী তাদের সেক্যুলার কর্মসূচীর ব্যর্থতাও বুঝতে পেরেছে এবং এজন্য তারা আরো কার্যকরভাবে ইসলামকে ব্যবহার

করার আশা করেছিলো। কিন্তু বেশ কয়েকটি কারণে এটি তেমন কোনো ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসেনি।

প্রথমত, যদিও শাসকরা কিছু ওলামা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো, কিন্তু সুন্নী ইসলাম কখনোই পুরোহিততন্ত্রের জন্য অনুকূল ছিল না। বরং এরকম যেকোনো প্রচেষ্টা বিকল্প কর্তৃত্বের দাবীকে আরো জোরালো করে। এর একটি উদাহারণ হলো মিশর সরকারের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। ইসলাম ভীষণভাবে কিতাবনির্ভর দ্বীন। আর শিক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে এর কর্তৃত্বপরায়ণতা বিরোধী অবস্থান মু'মিনদের নিকট ছড়িয়ে পড়ার পথই সুগম হয়েছে। ইসলামের যে চেতনা উমাইয়াদের (বিদ্রোহ আকারে) এবং এরপর আব্বাসীদের (ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের আকারে) স্বৈরাচারী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঠেকিয়েছে, সেই একই চেতনা বর্তমানকার সামরিক স্বৈরাচার এবং বাদশাদের দ্বারা অপব্যবহৃত হতে অস্বীকৃতি জানায়। জাতিকেন্দ্রিক প্রকল্পে ইসলামকে ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারার আরেকটি এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক কারণ হচ্ছে ইসলামী উম্মাহর বিশ্বজনীন প্রকৃতি। অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্র প্রকৃতগতভাবে ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ।

> মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে সরকারের অবৈধতার ফলাফল বিধ্বংসী প্রমাণিত হয়েছে। এ অবৈধতার একটি সরাসরি ও অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। এসব অনিশ্চয়তায় ভোগা দুর্বল ও হিংস্র সরকারগুলো অত্যাচার নিপীড়নের মাধ্যমে শাসনকার্য চালায় এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্তৃপক্ষগুলোকে নিজেদের সমাজের বিরুদ্ধে বেতনভোগী সৈনিক হিসেবে ব্যবহার করে। বিশ্বায়নকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এসব স্বৈরাচারীরা সামাজিকভাবে স্বীকৃত আলেমদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী পরিচিত বেতনভোগী আলেমদের ভাড়া করে। মজলুমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দিকে সাহায্যের জন্য তাকিয়ে থাকে, কিন্তু নিজেদের স্বার্থ যেখানে নেই সেখানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কালেভদ্রেই এগিয়ে আসে। এ ব্যাপারটি যেমন সরকারের অবৈধতাকে গভীর থেকে গভীরতর করে, তেমনি কোনো ভবিতব্য সংস্কারকের প্রতি অবিশ্বাসও বাড়িয়ে তোলে (যাকে স্বৈরাচারীরা বহিঃশক্তির দালাল ঠাওরাতে পারে)।

আধুনিক রাষ্ট্রের সেক্যুলার ধর্মতত্ত্ব

এসব সমস্যাগুলো দৈবক্রমিক কিছু নয় বরং এটাই অনিবার্য ছিল। কারণ রাষ্টগুলোকে ইসলামের মতো একটি জনপ্রিয় ধর্মের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। তারা এটাকে প্রয়োজন মাফিক রূপ দিয়ে তাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে। কিন্তু সেটা করতে স্বাভাবিকভাবেই তারা ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও আধুনিকতাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রেও ও ইসলাম ধারণাগত জায়গায় একেবারেই আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এটা কেবল ধর্মতাত্ত্বিক জায়গায়ই নয়; বরং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মালিকানা, পারস্পারিক সংহতি, আইনের শাসন, বহুত্ববাদ, পরমত সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ব্যাপারে, তার নিজস্ব শক্তিশালী ধারণা রয়েছে। যেসব বিশেষজ্ঞ ইসলামের ঐতিহ্য এবং এর জীবন্ত অভিজ্ঞতার ওপর

গভীর দৃষ্টিপাত করেছেন, তারা ইসলামের এই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন।[৮০]

সব জাতিরাষ্ট্রই নাগরিকদের প্রায়-সর্বাত্মক আনুগত্য দাবী করে এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গন্ডির বাইরের কোনো শক্তি দ্বারা তারা প্রভাবিত না হয় সেটা সর্বাত্মকভাবে নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র আইন তৈরী ও প্রয়োগ করে এবং জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেয়, রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষায় নাগরিকদের সে অন্যকে হত্যা করতে ও নিজের জীবন বিসর্জন করার জন্য নিয়োগ করে। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা সম্পন্ন উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের উপর রাষ্ট্র এমন কিছু জোর পূর্বক চাপিয়ে দিতে পারে না বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে এমনটা কদাচিৎ হয়ে থাকে। উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলো লুটেরা পুঁজিবাদের সামনে অসহায় হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। এই ব্যবস্থা ধর্মীয় অঙ্গীকারবদ্ধ এবং সামষ্টিক নৈতিকতাপূর্ণ জীবনযাপনকে লালন করতে পারে না। টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে ও সে তার অক্ষমতা প্রমাণ করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের কোনো সামষ্টিক ও সমুন্নত নৈতিক ব্যবস্থা নেই। ফলে এর নাগরিকরা হয় আন্তর্জাতিক করপোরেশন কিংবা বাকপটু নৃ-জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহৃত হয়। উদার গণতান্ত্রিক হোক বা না হোক, আধুনিক রাষ্ট্র কার্যত আইন, নৈতিকতা এবং নাগরিকদের জীবনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিক সংজ্ঞার দিক দিয়ে বিচার করলে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের যেকোনো স্বীকৃত রূপ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামী ঐতিহ্য ও ইতিহাসের বিশেষজ্ঞদের জন্য এটি খুবই প্রাথমিক জ্ঞানের বিষয়। এই সঙ্গতিহীনতাকে ওয়ায়েল হাল্লাক সাম্প্রতিক তার “The Impossible State” বইয়ে খুব জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, আধুনিক জাতিরাষ্ট্র যদি অনৈতিক নাও হয়ে থাকে তবে তা নীতি-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান তো বটেই এবং ইসলামকে ধারণ করার অনুপযোগী। তিনি এই বক্তব্য প্রদান করেছেন রাষ্ট্রের একটি বিশেষ ধারণাকে সামনে রেখে। যার ফলে তার বক্তব্যকে অনেকেই সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। তার দাবীকে এখানে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।

ইসলামের শুরুর দিকের শাসনব্যবস্থাকে আমরা “রাষ্ট্র” বলে অভিহিত করতে পারি কিনা সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ মিমাংসার বিষয়। এক্ষেত্রে সমাধানের মূল সূত্র হচ্ছে রাষ্ট্রকে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করছি। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সমসাময়িক বিশ্ব ও কল্পনার জগতকে সর্বাত্মকভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে, রাষ্ট্রের নানান ঐতিহাসিক বোঝাপড়াকে সে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এবং সেইসাথে ভবিষ্যতের জন্য কোনো প্রামাণ্য বিকল্প হাজির করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের ইতিহাসবিদগণ সাধারণত একমত যে, ইউরোপে কিছু নির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের কারণে ১৩০০ থেকে ১৬০০ সালের মধ্যে রাষ্ট্রের ধারণার আবির্ভাব ঘটেছে।[৮১]

বেশ কিছু ধারণার একত্রীকরণ পূর্বের অন্যান্য শাসনব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করেছে এবং একে “সর্বক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু এরপরেও ব্যক্তিসত্ত্বাহীন শক্তি” হিসেবে গড়ে তুলেছে। এ ধারণাসমূহ হচ্ছে: ক) শাসক অথবা শাসনকাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের থেকে বিমূর্তীকৃত ও পৃথক থেকে রাষ্ট্র একটি আলাদা আইনী ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা যা সম্রাট কিংবা শাসনকর্তা থেকে আলাদা একটি সত্তা। খ) ভৌগলিক সীমার মধ্যে রাষ্ট্রই একমাত্র আইনের উৎস; খোদা, চার্চ কিংবা মহান রোমান সাম্রাজ্য এক্ষেত্রে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। গ) রাষ্ট্রই এর নাগরিকদের একমাত্র যথোচিত আনুগত্যের অধিকারী।[৮২] ধর্মনিরপেক্ষতা, স্থানিকতা, বিমূর্ততা (ব্যক্তিসত্ত্বাহীনতা) এবং সার্বভৌমত্বকে তাই আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইতিহাসবিদদের দেয়া এই সর্বোচ্চ-পরিসরীয়

(maximalist) রাষ্ট্রের সংজ্ঞার সাথে সাথে ন্যূনতম (minimalist) রাষ্ট্রের সংজ্ঞার তুলনা করা যেতে পারে। ন্যূনতম রাষ্ট্রের সংজ্ঞা চার্লস টিলি প্রদান করেছেনঃ

রাষ্ট্র পরিবার ও গোত্র ব্যবস্থা থেকে পৃথক বলপ্রয়োগকারী একটি সংস্থা, যা একটি বাস্তব সীমানার মধ্যে কিছু বিষয়ে অন্য যেকোনো সংস্থার চাইতে বেশি অগ্রাধিকার চর্চা করে।[৮৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতকালে মদীনার শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে এ অর্থে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করতো, যেটা আবু বকরের (রা) শাসনামলে আরো সুদৃঢ় হয়। তবে রাষ্ট্রের এই দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিও ইসলামের এ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি সংজ্ঞায়িত করতে পারে না। সেজন্য হাল্লাকের অনুসরণে প্রাক-আধুনিক ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ধরনের সারমর্ম তুলে ধরতে শাসন অথবা, আরো ভালো হয় যদি, শাসনব্যবস্থা শব্দ ব্যবহার করা হয়।

> সত্যিকারার্থে আধুনিক রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত এবং ব্যক্তিসত্ত্বাহীন একটি প্রতিষ্ঠান। এবং এটি তার নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা রাজবংশ থেকে পৃথক সত্তা। এটি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপ উদ্ভূত এমন একটি নতুন ক্ষমতার ধরণ, যা ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বা ফিক্বহের সাথে সাংঘর্ষিক। রাজনৈতিক দার্শনিক ও ইতিহাসবিদরা অনেকদিন ধরেই বলে আসছেন, ঐতিহ্যবাহী খ্রিষ্টধর্মে যে ক্ষমতা খোদার জন্য নির্ধারিত ছিল, রাষ্ট্র সে ক্ষমতা নিজের জন্য নির্ধারণ করে নেয়।

উদাহারণস্বরূপ কার্ল শ্মিটের Political Theology থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে, যেটা আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বে সর্বাধিক উদ্ধৃতঃ

আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ ধারণা মূলত ধর্মনিরপেক্ষকৃত ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা। এই ধারণাগুলো খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে রাষ্ট্রতত্ত্বে স্থানান্তর ঘটেছে। যেমনঃ ধর্মতত্ত্বের সর্বশক্তিমান খোদা থেকে রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান আইনদাতার ধারণা এসেছে। তবে এটা ইতিহাস পরিবর্তনের এই বিশেষ ধরনের বিকাশের সাথেই সম্পৃক্ত তা নয় বরং রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোও সেটা নির্দেশ করে। এ বিষয়গুলির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ জরুরি। বিবেচনার জন্য এগুলোকে স্বীকৃতি দেয়াটা জরুরী।[৮৪]

এই পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে স্পষ্ট এ পর্যালোচনার সুস্পষ্ট দিক হচ্ছে, ধর্মতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ধারণাগুলো নতুন করে ধর্মতত্ত্বের রূপে হাজির হচ্ছে এবং এগুলোই মূলত আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ঠিক করছে। এবং এক্ষেত্রে সে নিজেকে ধর্ম তত্ত্বের হওয়া এবং ধর্মতাত্ত্বিক সার্বভৌমত্ব (খোদার মতো প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব নিয়ে আইন প্রণয়ন করা এবং সেগুলোর ব্যতিক্রম নির্ধারণ করা), ভূখন্ড (একটি সীমাবদ্ধ এলাকা যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত), জনগণ (জাতির মহত্ব ও এর পৌরাণিক অতীতে বিশ্বাসীর দল), নাগরিকত্ব (রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে জনগণকে দেয়া অধিকার, যা অনাগরিকদের দেয়া হয় না)[৮৫] ইত্যাদি ধারণা ধর্মতত্ত্বের মতো করেই রাষ্ট্রকে নির্দারণ করছে।

তবে আমার মতে, এ পর্যবেক্ষণের আরো গুরুতর দিক হল আধুনিক রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদি আদর্শের সাথে আধুনিক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে পারা। অর্থাৎ, রাষ্ট্র অন্তঃসারশূন্য

কোনো কিছু নয় যেটাকে যেকোনো আদর্শ দিয়ে পূর্ণ করা যাবে, বরং রাষ্ট্রের নিজেরই একটি আদর্শ আছে। এটাই ওয়ায়েল হাল্লাক নিম্নরূপে তুলে ধরেছেনঃ আধুনিক ইসলামপন্থী বয়ানে আধুনিক রাষ্ট্রকে শাসনকার্য পরিচালনার একটি নিরপেক্ষ হাতিয়ার হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ফলে তারা মনে করে শাসকবৃন্দের পছন্দ ও নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য এটাকে ব্যবহার করা যায়।[সুতরাং] একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে এটাকে [পরিণত] করা সম্ভব যেখানে কোরআনপ্রদত্ত মূল্যবোধ ও আদর্শসমূহের বাস্তবায়ন করা যাবে, যেগুলোকে নবী (সা) তাঁর মদীনার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে অতীতে বাস্তবায়িত করেছিলেন।[ব্যাপারটি আসলে এরকম নয়।] রাষ্ট্র সহজাতভাবে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং একইমাত্রায় মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরী করে অর্থাৎ রাষ্ট্র নির্দিষ্ট জ্ঞানব্যবস্থা গড়ে তোলে যা ব্যক্তি ও সামষ্টিক কর্তা স্বত্তার বৈশিষ্ট্যাবলি নির্ধারণ ও এর রূপদান করে। এভাবেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনের অর্থ অনেকাংশে নির্ধারিত করা হয়।[৮৬]

আদর্শিকভাবে রাষ্ট্রের এরকম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবার অন্যতম কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র নিজেই একইসাথে আইনদাতা, বিচারক ও নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারি। এই প্রবল ও সর্বাত্মক ক্ষমতা আপাতদৃষ্টিতে একটি বিমূর্ত স্বত্তা বলে মনে হলেও বাস্তবে তা সবসময়ই একদল মানুষ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ব বিশ্বশক্তিগুলো কার্যকর রাখে। জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থা নামক আন্তর্জাতিক চুক্তির নামে তারা এটাকে বলবৎ রাখে। কিন্তু রাষ্ট্র নামক দানবসুলভ এই প্রতিষ্ঠানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ব্যাপারটি প্রতিভাত হয়ে উঠলে তাকে নিয়ন্ত্রণের নানান ধারণার জন্ম হয়, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের নানান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পারিক ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন, সাংবাধিনভাবে ক্ষমতার পৃথিকীকরণ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা। এই নিরুঙ্কুশ ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য আনয়নের জন্য নানান ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় সত্তার অধীনে থেকেই কাজ করতে হয়। ফলে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশতা বজায় থাকে।

ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোতে (পৃথিবীতে কি কোথাও পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে?) এই সর্বাত্মক ক্ষমতার ব্যাপারটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এবং ক্ষমতার পৃথকীকরণ পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর থাকে না। কিন্তু অসংখ্য আইনী ইতিহাসবিদরা দেখিয়েছেন, ক্ষমতার পৃথকীকরণ তত্ত্ব এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বাধিক উন্নত দেশগুলোতেও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয় না।[৮৭] নানান সংকটকালে বা ব্যতিক্রমী বাস্তবতার অজুহাতে যেমন যুদ্ধ এবং বিজয়ের সময়গুলোতে রাষ্ট্র ঠিকই নিরঙ্কুশ শক্তি ও নশ্বর খোদা হিসেবে আচরণ করে এবং লেভিয়াথান-এ পরিণত হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নানান বিভাগ সমন্বিতভাবে তার ক্ষমতাকে নিশ্চিত করে। আর এই সংকটকাল বা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি চলতেই থাকে। ইংরেজ দার্শনিক থমাস হবস রাষ্ট্রের এই সর্বাত্মক ক্ষমতা বুঝাতে লেভিয়াথান নামক পৌরাণিক দানব চরিত্রকে ব্যবহার করেছেন যার ক্ষমতা অসীম। রাজনীতিক জীবনে শাসকরা নানান ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড করতে পারে। যেমনঃ ব্যক্তি হিসেবে দুর্বৃত্তের মতো আচরণ করতে পারে কিংবা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে, বৈষম্যমূলক নীতি চালু করতে পারে অথবা সেগুলোর স্বেচ্ছাচারমূলক প্রয়োগ করতে পারে। এসবই নিঃসন্দেহে অনাচার এবং রাজনীতিতে প্রায়শঃই দেখা যায়।

> তবে এটাকে অতিক্রম করা ইসলামী ধর্মতত্ত্বের জন্য বড় কোনো সমস্যা ছিল না। ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা সবসময়ই ইসলামী আদর্শের ওপর ভিত্তি করে নিঃসংকোচে শাসকদের সমালোচনা ও তিরস্কার করেছে, এমনকি কখনো কখনো তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের

> ন্যায্যতাও প্রদান করেছে। হাল্লাক ও অন্যান্যরা দেখিয়েছেন, ইসলামী কাঠামোর মধ্যে আধুনিক রাষ্ট্রের অসাম্ভব্যতার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র সংজ্ঞাগত ও কাঠামোগত দিক থেকে চূড়ান্তভাবে কর্তৃত্ববাদী। ধর্মীয় মতামত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হয়, উল্টোটা নয়। যদি রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী "মুসলিম" বা "ইসলামী"ও হয়, তবুও উপরোল্লিখিত বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, আধুনিক রাষ্ট্র ইসলামী হতে পারে না; এটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং অন্যসব কিছুকেই ধর্ম নিরপেক্ষ বানাতে তৎপর। কিন্তু রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও, ধর্মের অপব্যবহার করা থেকে তাদের থামানো যায়নি। এ অপপ্রবণতা এমনকি ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা গিয়েছে। তাই ইসলামী রাষ্ট্র একটি সসাংঘর্ষিক ধারণা (oxymoron) এবং এটি গত কয়েক দশকে নিজেদের ইসলামী বলে দাবী রাষ্ট্রগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত।

আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের আরো গুরুতর অসঙ্গতির জায়গা হলো, ভৌগলিক সার্বভৌমত্ব নামক সংকীর্ণ ধারণা। আঞ্চলিক বা ভৌগলিক সম্পৃক্ততার ওপর ভিত্তি করে অধিকার ও কর্তব্যের দিক দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোনো ফারাক করে না ইসলাম। মুসলিমদের মধ্যকার সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহয় এত বেশি নির্দেশনা এসেছে যে, একমাত্র সাময়িক ও প্রায়োগিক বিবেচনা ছাড়া কোনো অঞ্চলের মুসলিমদের অন্যান্য মুসলিমদের প্রয়োজন, অধিকার, সম্পদ এবং যন্ত্রণা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। রোহিঙ্গা, উইঘুর, ফিলিস্তিন এবং কাশ্মীরিদের ওপর চলা জুলুম নির্যাতনের জবাবে পদক্ষেপ নেয়া তাই সকল মুসলিমদের জন্য একটি সরাসরি কোরআনী নির্দেশনা, যেটাতে কেবলমাত্র দূরত্ব ও সাধ্যতার বিবেচনায় কিছুটা ছাড় দেয়া যেতে পারে। যে রাজনৈতিক কাঠামোকীকরণ ব্যক্তি আনুগত্যকে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে দেয় তা মৌলিকভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে কোনো ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যকে আধুনিক রাষ্ট্র মারাত্মক সমস্যা আকারেই বিবেচনা করে, যা অতীতে ইসলামী অঞ্চলসমূহের নির্ধারক বৈশিষ্ট্য ছিল ভৌগলিক সীমার উর্ধ্বে থাকা সুবিস্তৃত ইলমী, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সূফী নেটওয়ার্ক। এ ধরণের প্রতিষ্ঠা জাতিরাষ্ট্রের দাবীর প্রতি এখনো চ্যালেঞ্জ পোষণ করে চলেছে। ভৌগলিক বা আঞ্চলিক সরকারগুলোর সীমিত পৌর ও শাসনসংক্রান্ত স্বাধীনতা অবশ্যই সম্ভব (এবং আকাঙ্ক্ষণীয়ও বটে), কিন্তু জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এর চেয়ে অনেক বেশী দাবী করে। এজন্য একটি বিমূর্ত ও সার্বভৌম রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসেবে রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থা হিসেবে কোনো অঞ্চলের প্রশাসন ও আইনযন্ত্র এক নয়। এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক করতে পারাটা জরুরি। সব আঞ্চলিক সরকারব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় এবং ইতিহাসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ভবিষ্যতকল্পিত খিলাফতকে একটি অতিকায় আঞ্চলিক রাষ্ট্র (regional supertate) করা হবে, এমন চিন্তাবিভ্রমের কোনো সুযোগ নেই।

জাতিরাষ্ট্রের আরো অনেক সমালোচনা করা যেতে পারে এবং করা হয়েছেও। কিন্তু আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য জাতিরাষ্ট্রের সামগ্রিক সমালোচনা হাজির করা নয় বরং কেন মুসলিম বিশ্বে জাতিরাষ্ট্রের গভীর সংকটময় ইতিহাস বিদ্যমান তা ধরতে পারা। সেইসাথে কেন জাতিরাষ্ট্রের সমাপ্তি মুসলিমদের জন্য অধিকতর ইসলামী এবং মানবিক রাজনৈতিক অস্তিত্ব গড়ার ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে আসতে পারে, তার কিছু কারণ বর্ণনা করা।

সামনের দিকে তাকানো

> **অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দার্শনিকদের চিন্তা ভুল হোক বা সঠিক, যতটা ধারণা করা হয় তার চেয়েও অনেক শক্তিশালী। পৃথিবী চালনায় অন্য কিছুর ভূমিকা খুব কমই।**[৮৮]

আধুনিক রাষ্ট্রের যে সমালোচনা আমি পেশ করেছি সেটা অনুযায়ী ভবিষ্যত খিলাফতকে অতিকায় জাতিরাষ্ট্র অথবা স্রেফ বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলোর সংযোজন হিসেবে চিন্তা করলে হবে না, বরং একে এমন এক শাসনব্যবস্থা হিসেবে কল্পনা করতে হবে যেটার বৈধতার ভিত্তি ওয়েস্টফেলিয়া, জাতীয়তাবাদ এবংং সেক্যুলারিজমের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দর্শন থেকে আলাদা হতে হবে। অর্থাৎ বিকল্প এক রাজনৈতিক দর্শনের ওপর তাকে নির্ভর করতে হবে।। এর জন্য আধুনিক অভিজ্ঞতা থেকে মুখ ঘুরিয়ে আগে থেকে তৈরী করে রাখা কোনো প্রাক-আধুনিক মডেলের ওপর ভরসা করলে হবে না, বরং অতীত থেকে প্রজ্ঞা ও নির্দেশনা আহরণ করে সামনের দিকে তাকাতে হবে, সেইসাথে চিন্তার পরিসরকে প্রশস্ত করতে হবে এবং আধিপত্যশীল শ্রেণীবিভাগের বাইরে গিয়ে সমসাময়িক অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা নিতে হবে। আমরা যখনই নিজেদের এই ভুল ধারণা থেকে বের করে আনতে পারবো যে, জাতিরাষ্ট্র অপরিহার্য (যতক্ষণ না বিদেশী প্রভু ও প্রামাণ্য গ্রন্থগুলো আমাদের অন্য কিছু ভাবতে দিচ্ছে), অতীত ও বর্তমান থেকে অনেক শিক্ষা নেয়ার সুযোগ সামনে চলে আসবে।

সৃষ্টিশীল উপায়ে খিলাফতকে আবার ফিরিয়ে আনার চিন্তা মোটেও কল্পনাতীত কোনো বিষয় নয়; এভাবেই অনেক স্বাধীন মুসলিম চিন্তাবিদগণ ভবিষ্যতকে কল্পনা করেছেন। প্রভাবশালী মিশরীয় আইনজ্ঞ আবদুর রাযযাক আল-সানহুরী (১৮৯৫-১৯৭১) ছিলেন মিশর, ইরাক ও অন্যান্য আরব দেশের সিভিল আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচয়িতা। খিলাফতকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল উপায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তাঁর দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ছিলঃ

> "যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিতে খেলাফতে রাশেদা বা পূর্ণাঙ্গ খেলাফত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, এ অবস্থায় মুসলিম বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেয়া পরিস্থিতি মাথায় রেখে অপূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসনব্যবস্থা (হুকুমত) প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এ ব্যবস্থাকে (নিযাম) অবশ্যই অপূর্ণাঙ্গ ও সাময়িক বিবেচনা করতে হবে...ভবিষ্যতের আদর্শ খিলাফত ব্যবস্থাকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে। কেননা আমরা দেখেছি, শরীয়া কোনোভাবেই শাসনব্যবস্থার জন্য একটি নির্দিষ্ট (প্রশাসনিক) কাঠামো চাপিয়ে দেয় না।"[৮৯]

তিনি সম্ভাব্য ও কার্যকর খিলাফতের জন্য নিম্নলিখিত প্রশস্ত শর্তগুলো প্রস্তাব করেনঃ

১) ইসলামী বিশ্বের একত্রীকরণ;
২) ইসলামী আইনের প্রয়োগ;

৩) কিছু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য যেগুলোকে তিনি নিম্নরূপে আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেনঃ

ক) ক্ষমতার পৃথকীকরণঃ ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা বলে, কোনো একক ব্যক্তি বা দলের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের ফলে ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রের ওপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রভাব বিস্তার হয়।

খ) আইনী সংস্কারঃ ইসলামী ঐতিহ্যগত আইনব্যবস্থা (ইবাদত ও খাঁটি ধর্মীয় দিক বাদ দিয়ে) স্থবিরতার মধ্যে আটকে গেছে। যে কারণে ইসলামী আইনকে প্রয়োগের আগে এক্ষেত্রে গভীর গবেষণা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পুনঃজাগরণের প্রয়োজন।

গ) বিকেন্দ্রীকতা এবং প্রাদেশিকতাঃ ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা বলে, একটি জোরালো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে ইসলামী বিশ্বের ঐক্য স্থিতিশীলতার সাথে বজায় রাখা যায় না। তাছাড়াএরূপ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ইসলামী ফিকৃহী দৃষ্টিকোণ থেকেও আকাঙ্ক্ষিত কিছু নয়। খিলাফতের যেকোনো প্রকল্পকে বিকেন্দ্রিক হতে হবে এবং প্রত্যেক অঞ্চলকে স্ব-শাসনের জন্য বড় মাত্রায় স্বাধীনতা দিতে হবে।[৯০]

সানহুরী নিছক স্বপ্নচারী ছিলেন না; এ ধরনের বহুস্তর বিশিষ্ট শাসনব্যবস্থায় কী কী প্রশ্ন সামনে আসবে এবং সেগুলোকে কিভাবে মোকাবেলা করা হবে, এমনকি নিম্নপর্যায়ে ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ে কমিটি গঠন করা সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি তাঁর পরবর্তী গবেষণাগুলোতে বিস্তারির আলোচনা করেছেন। আবার অমুসলিম নাগরিক ও প্রাচ্যের প্রতিবেশী অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অধিকারের ব্যাপারে যে সংবেদনশীলতা প্রয়োজন সেটাও বিস্তারিতভাবে তাঁর এই আলোচনায় উঠে এসেছে।

এই সূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামো আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রকল্পায়নের প্রতিনিধিত্ব করে এবং কোনো সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তা একে উপেক্ষা করতে পারে না। সাম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী পন্ডিত জর্জ উইল তাঁর বই “The Conservative Sensibility” বইয়ের জন্য দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন যে, বুশ প্রশাসনের ইরাকে গণতন্ত্র আনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ ইরাকে জন লকের মতো দার্শনিক, জর্জ ওয়াশিংটনের মতো রাজনীতিবিদ, আলেক্সান্ডার হ্যামিল্টনের মতো স্বপ্নদর্শী অর্থনীতিবিদ নেই। সেইসাথে ইরাকের সমাজ অষ্টাবিংশ শতাব্দীর আমেরিকান সমাজের মতো ছিল না। তাঁর বৃহত্তর যুক্তি এই যে, কিছু রাজনৈতিকভাবে সৃজনী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিই আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে; আর এই ব্যবস্থাই একটি সফল গণতন্ত্রের জন্য যে সংস্কৃতি ও কর্তসত্তার প্রয়োজন তা তৈরী করেছে। অন্য কথায়, একটি সফল রাজনৈতিক প্রকল্পের জন্য এই তিনটি উপাদানের প্রত্যেকটিই প্রয়োজনঃ কিছু অভিন্ন আদর্শের সমষ্টি, একদল ব্যতিক্রমী ও সাহসী স্বপ্নদর্শী চিন্তাবিদ এবং তাদের রূপপ্রকল্পে সাড়া দেয়ার মতো একটি সমাজ। জর্জ উইল ইরাকের উপর কোনো বিশেষজ্ঞ নন বললেই চলে। অন্যদিকে আমেরিকার ইতিহাসে রয়েছে রক্তপাতের নানান দৈব ঘটনার প্রভাব। আমেরিকার প্রতি পক্ষপাতের ফলে এ বিষয়গুলি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু এরপরেও স্বপ্নদর্শীদের প্রয়োজনীয়তা, সমাজের সমর্থন লাভ করা, এবং, বিশেষ করে, বাইরে থেকে আমদানীকৃত সমাধানের ব্যর্থতা—এসব ব্যাপারে তার অন্তর্দৃষ্টি সঠিক। সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হল আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার ব্যাপারে উইলের পর্যবেক্ষণ; উইলের কাছে এই ঘোষণার উদ্দেশ্য নতুন অধিকার আবিষ্কার ছিল না, যা উর্ধ্ব হতে নিম্নপর্যায়ে আরোপিত হবে, বরং ইতোমধ্যেই বিদ্যমান অধিকারগুলোর সুনিশ্চিতকরণ ছিল, যেগুলোকে খোদাপ্রদত্ত অধিকার বলে

ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো।[৯১]

> আমরা খিলাফতকে আঞ্চলিক সরকারসমষ্টির ফেডারেশন হিসেবে কল্পনা করতে পারি, যে সরকারগুলো গণতান্ত্রিকভাবে বা শূরার যেকোনো সংখ্যক ঐতিহ্যবাহী বা এখনো অনাবিষ্কৃত প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে শাসিত হতে পারে। শূরার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ দ্বারা আমি প্রতিনিধিত্ব, পরামর্শ এবং জবাবদিহিতা বুঝাচ্ছি। ইসলামী আইন সহজাতভাবেই বহুত্ববাদী এবং এর সম্প্রদায়গত মূল্যবোধগুলো অমুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেয় না। এটা এজন্য যে, ইসলামের সম্প্রদায়গত জীবন ও শাসনের ধারণা মৌলিকভাবেই নিম্ন হতে ঊর্ধ্বপর্যায়গামীঃ মানুষ কেবল সে আইন দ্বারাই শাসিত হতে পারে যেটাতে তারা বিশ্বাস করে। ইসলামী শাসনব্যবস্থার আরেকটি প্রাসঙ্গিক প্রতিশ্রুতি হচ্ছে পরিবার ও সম্প্রদায়ের একতা রক্ষা। ইতিহাস জুড়ে বিকশিত হওয়া ইসলামী ঐতিহ্যের তৃতীয় প্রতিশ্রুতি হচ্ছে শাসনব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা এবং আঞ্চলিক রীতিনীতিকে সমীহ করা। যখনই আধুনিকায়নে সচেষ্ট জাতিরাষ্ট্রগুলো এসব মানদন্ড পরিত্যাগ করে জোর করে ইসলামী আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করার চেষ্টা করেছে, এর সর্বনাশা অপব্যবহার ঘটেছে।[৯২]

এসব অঙ্গীকার মিলিতভাবে এমন একটি সাংবিধানিক নকশা নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর সরবরাহ করবে, যা সরকারের ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করবে। সমন্বয় ও রোধন করবে। মুসলিম সরকারসমূহের যেকোনো ভবিষ্যত কনফেডারেশনের প্রাতিষ্ঠানিক নকশাঙ্কনের জন্য ইসলামী ঐতিহ্যের অতীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সেই সাথে সমসাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেগুলো এই প্রকল্পের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেগুলোকে ব্যবহার করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এটা কোনো সহিংস বিপ্লবের ডাক নয়, কেননা এ ধরনের বিপ্লব শুধুমাত্র সন্ত্রাসের রাজত্বই কায়েম করবে। এটা খিলাফতের যে প্রশস্ত ও সাধারণ তাত্ত্বিক কাঠামো বিদ্যমান সেটার মধ্যেই নতুন বয়ান ও রেওয়াজ চালুর আহবান, যা বিশ্বের মুসলিমদের সামষ্টিক ভবিষ্যতকে গুরুত্বের সাথে নেবে। এটা মুসলিমদের প্রতি তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বর্তমান কর্তব্য ও দায়িত্বগুলোকে অবহেলা না করেই বড় স্বপ্ন দেখার আহবান, স্থানিকভাবে কাজ করেও বৈশ্বিকভাবে চিন্তা করার আহবান। এটা আলোচনা-প্রতিআলোচনা, যোগাযোগের জাল বিস্তার, পুনঃচিন্তা এবং মুসলিম হিসেবে রাজনৈতিকভাবে বাঁচার সম্ভাবনার পুনঃস্বপ্ন দেখার আহবান। এটা সব তরুণ মুসলিমদের প্রতি কৃত্রিম সীমানাকে উৎরে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং নিজেদের এসব প্রায়োগিক ও নৈতিক প্রশ্নগুলো করার আহবানঃ *কিভাবে আমরা আরো ভালোভাবে নানান সমস্যার সমাধান করতে পারি*

> মুসলিম উম্মাহ নানান সমস্যায় জর্জরিত। যেমনঃ ঈমান ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা হারানো, শাসকশ্রেণীর ঔদাসীন্য ও দুর্নীতির সমস্যা, সহায়হীন উদ্বাস্তুদের অবস্থার উন্নয়ন, আমাদের নির্যাতিত দ্বীনি ভাইদের সহায়তা, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবর্তন, দ্বীনি বয়ানগুলোর উন্নয়ন, ফিরক্বাগত ও রাষ্ট্রসীমার ঊর্ধ্বে উঠে আন্তঃমুসলিম দ্বীনি সংলাপ ও বয়ানকে সমৃদ্ধ করা, দূরত্ব, ভাষা ও বৈষম্যের বহু প্রাচীর উৎরে

মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা ও যোগাযোগ উন্নত করা প্রভৃতি। এসব সমস্যা মোকাবেলা করার রাস্তা বের করতে পারাটা জরুরি।

এসব প্রশ্নের সমাধান এমন হতে হবে, যা স্বৈরশাসক ও সন্ত্রাসীদের শুধুমাত্র আদর্শিকভাবেই পরাজিত করবে না, তাদের কৌশল ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীকেও পরাজিত করবে। যখন আইসিসের কার্যক্রম ছিল তুঙ্গে এবং পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোও ছিন্ন মাথা ও রক্তক্ষয়ী আত্মঘাতী হামলার ওপর সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য পরস্পরের সাথে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছিল, এই বিষয়ে গবেষণারত অবস্থায় আমি পত্রিকার শিরোনামগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিনি, বরং ব্যক্তিগতভাবে আইসিসকে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। বিশেষ করে পশ্চিমা গণমাধ্যমের জন্য এই দল সহিংসতার যে 'পর্ণোগ্রাফী' তৈরী করে যাচ্ছিল সে ব্যাপারে আমি যেহেতু বরাবরই সন্দিহান ছিলাম, তাই আমি তাদের ব্যাপক সহিংসতা ও অন্য মুসলিমদের তাকফীর করার চর্চাসূত্র বের করার জন্য তাদের প্রকাশনাগুলো (যেমনঃ চাকচমকপূর্ণ 'দাবিক' ম্যাগাজিন) পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। তাদের বুঝতে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তাদের সদস্য ও সমর্থকদের পারস্পরিক আচরণের ওপর প্রতিবেদনগুলো, যেগুলো তেমন একটা সাড়া ফেলেনি ও বেশিরভাগ সময়ই উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। এ ব্যাপারে বহু সূত্র আমার জন্য সামগ্রিক একটি চিত্র তৈরী করে দেয়ঃ পশ্চিমা, ইউরোপীয় ও শ্বেতবর্ণের নিযুক্ত সদস্যদের শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করে তাদের সাথে সে অনুযায়ী ব্যবহার করা হত এবং তাদেরকেই উচ্চতর পদে নিয়োজিত করা হতো, যেখান থেকে তারা সংগঠনের বার্তা ও গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতো। অপেক্ষাকৃত গরীব ও গাঢ় বর্ণের নিযুক্ত সদস্যরা নিয়মিতভাবে লাঞ্ছনা ও প্রান্তিকতার শিকার হত। শিশুদের একদম শুরু থেকেই জ্ঞান, যৌক্তিকতা ও সমবেদনার বদলে সহিংসতা ও ঘৃণা শেখানো হত। ক্লাসিক্যাল গ্রন্থগুলো থেকে পছন্দ অনুযায়ী ফিকহী মত প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হতো, কিন্তু এর পেছনের ইতিহাস, পরিপ্রেক্ষিত এবং বৈচিত্র্যের প্রতি খেয়াল রাখা হত না। তাদের ধ্বংসাত্মক বাণী ছিল ইসলামী ঐতিহ্যের এসব মৌলিক গুণাবলির বিপরীত। আমি জানতাম, আইসিসের এসব বৈশিষ্ট্যগুলো সি আই এ-র প্রোপাগান্ডিস্টদের পক্ষে উদ্ভাবন করা সম্ভব ছিল না। আর এগুলোই আইসিসের অন্তঃসার উন্মোচিত করে। অসংখ্য প্রোপাগান্ডা ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ একটি ময়দানে, এসব নগণ্য তথ্যগুলোই আমাকে এই ক্ষুব্ধ দুর্বৃত্ত ও চিত্তবিকারগ্রস্থদের দলকে বুঝতে সাহায্য করেছে। এরাই সেই “মারিকা” ও “খাওয়ারিজ” যাদের ব্যাপারে প্রিয় নবী (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তাদের এভাবে সমালোচনা করেছেনঃ “তারা হবে নির্বোধ তরুণ, যারা কোরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কন্ঠনালীর নিচে যাবে না।”[৯৩]

একটি ন্যায়পরায়ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য কাজ করা কোনোভাবেই অবনমিত হৃদয়ের ইবাদত, পিতামাতার প্রতি সম্মান, উত্তম সংসার, গভীর বন্ধুত্ব, শক্তিশালী আঞ্চলিক সম্প্রদায় এবং অবহেলিত ও দুর্বলদের জন্য ন্যায়বিচার সুনিশ্চিতকরণের জন্য কাজ করার বিকল্প হতে পারে না।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থাকে বজায় রাখতে চাওয়া একটি অবাস্তব স্বপ্ন, কিন্তু এই অবস্থাকে পরিবর্তন করার স্বপ্ন অবাস্তব নয়। মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা অনৈসলামিক, অনৈতিক এবং মুসলিমদেরও বৃহত্তর পরিসরে মানবজাতির সুন্দর একটি ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর। এ অবস্থা বজায় রাখতে চায় শুধুমাত্র ছোট ও ক্রমান্বয়ে আরো ছোট হয়ে আসা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর একটি দল। এসব স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য এসব সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী শুধুমাত্র তাদের দেশের অধিকাংশ জনগণকে

দমিয়ে রাখে অথবা স্বাধীন নৈতিক চিন্তার প্রতিটি সুযোগকে গলাটিপে হত্যা করে এমন নয়, ইসলাম বিকৃতকরণ ও মুসলিম সমাজগুলোকে ব্যাপকভাবে মগজধোলাই করার কাজও তাদের করতে হয়। এসব, উদ্ভট দমনাত্মক এবং প্রায় ব্যর্থরাষ্ট্রগুলো আইসিস থেকে কেবল বাহ্যিকভাবেই আলাদা। এরা মুসলিমদের মধ্যকার সংহতির অনুভূতি ধ্বংস ও একে প্রতিস্থাপিত করতে, সেইসাথে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ধর্মতাত্ত্বিক, ফিক্বহী এবং নীতি-নৈতিকতার বয়ানগুলোকে সঙ্কুচিত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমার প্রস্তাবনা এটাই যে, খিলাফতকে ইসলামের কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে সরকারগুলোর একটি কনফেডারেশন হিসেবে কল্পনা করতে হবে, যেটি সবার জন্য নির্দিষ্ট মানবাধিকারসমূহ রক্ষা করবে, এসব অঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করবে এবং মুসলিমদের বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিকাশের সাথে সাথে এসব অঞ্চলে বৃহত্তর দ্বীনি ও সাংস্কৃতিক একতাকে আলিঙ্গন করে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই ব্যবস্থা যে শুধুমাত্র খোদায়ী হুকুমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে তাই নয়, বরং পরস্পরকে শক্তিশালী করা স্বৈরশাসক ও সন্ত্রাসীদের দলের দীর্ঘমেয়াদী বিকল্পও হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১ Diyar Guldogan, “Turkish Republic continuation of Ottoman Empire,” Anadolu Agency, 10 Oct 18, http://aa.com.tr/en/todays-headlines/turkish-republic-continuation-of-ottoman-empire/1059924 (Accessed 19 Dec 2018). See also, Rashid Dar, “The Other C-word: Caliphate,” http://ciceromagazine.com/features/the-other-c-word-caliphate/

২ Azadeh Moaveni, “The Lingering Dream of an Islamic State,” *New York Times* , 12 Jan 2018.

৩ প্রাগুক্ত

৪ এই পর্যবেক্ষণ ছিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান ইহুদী সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ নোয়াহ ফেল্ডম্যানের তার বইয়ে *The Fall and Rise of the Islamic State* (Princeton University Press, 2008), 1.

৫ John Keane, *The Life and Death of Democracy* (W. W. Norton & Company, 2009): “নতুন গণতন্ত্রটি ছিল জারজ। এর জন্ম অনিচ্ছাকৃত ছিল। এর টিকে থাকার কখনোই কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এটি অনিবার্যও ছিল না” (161).

৬ Sheldon S. Wolin and Nicholas Xenos (eds.), *Fugitive Democracy and Other Essays* (Princeton University Press,

৭ এই উদ্ধৃতিটি কোরআনে প্রায় একই শব্দে পাঁচবার এসেছে, উদাহারণস্বরূপ দেখুনঃ ২:১২৬

৮ এমন প্রতিবেদনের কিছু নমুনা, যদিও সেগুলো পশ্চিমা সাংবাদিকদের খেয়ালমাফিক অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত নয়: □Despots are pushing the Arab world to become more secular,□ *The Economist* , 2 Nov 2017,

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/11/02/despots-are-pushing-the-arab-world-to-become-more-secular; □The Arab world in seven charts: Are Arabs turning their backs on religion?□ 24 Jun 2019, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48703377.

৯ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* .(Touchstone, 1993/1996).

১০ Benjamin R. Barber, *Jihad Vs. McWorld* (Ballantine Books, 1996).

১১ John Gray, John, *Endgames: Questions in Late Modern Political Thought* (Polity Press, 1997).

১২ Stephen D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (Princeton University Press, 1999).

১৩ উদাহারণস্বরূপঃ Kenichi Ohmae, *The End of the Nation-State: The Rise of Regional Economies* (Free Press, 1995); Luigi Padula, *End of the Nation-State: A Historical Perspective* (2015).

১৪ Peter Dockrill, *Business Insider*, 6/26, https://www.businessinsider.com/climate-apartheid-united-nations-report-2019-6 (Accessed 7/4/19).)

১৫ এই যুক্তি দেখান হয়েছে Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity□s Moral*

Predicament (Columbia University Press, 2012); এখানে হাল্লাক বলেন,আধুনিক জাতিরাষ্ট্র কোন নিরপেক্ষা বন্দোবস্ত নয় যাকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায় যেমনটা কিনা ইসলামী সংস্কারবিদরা প্রথমে ভেবেছিলেন, বরং তা হচ্ছে নীতি-নিরপেক্ষ এবং ইসলামের যেকোন ঐতিহাসিক রূপের সাথে অসঙ্গতিশীল। এন্ড্রু মার্চ তার সাম্প্রতিক বই *The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought* (Harvard University Press, 2019)-এ বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের ইসলামায়নের বিভিন্ন ব্যর্থ প্রচেষ্টা তুলে ধরেছেন, যা হাল্লাকের তত্ত্বেরই সত্যায়ন করেঃ □এটি প্রাক-বিপ্লবী আদর্শিক দাবী □রাষ্ট্র শরীয়া দ্বারা চালিত হতে হবে□ এই দাবী থেকে □রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা, টিকিয়ে রাখা

এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য যাই দরকার সেটাই শরীয়া আইন এই দাবীতে পরিণত হওয়া মাত্র এক ধাপ বাকি (২২৫)।

১৬ Salman Sayyid, *Recalling the Caliphate* (Hurst & Co. 2014), 190911.

১৭ Richard A. Shweder, Geertzs Challenge: Is It Possible to Be a Robust Cultural Pluralist and a Dedicated

Political Liberal at the Same Time?, in Austin Sarat, Lawrence Douglas, and Martha Merrill Umphrey (eds.), *Law*

without Nations (Stanford Law Books, 2010), 226.

১৮ Columbia University Press, 2018.

১৯ Arjun Appaduri, Across the World, Genocidal States Are Attacking Muslims. Is Islam Really Their Target?, *Scroll.in* , 22 May 2018, https://scroll.in/article/879591/from-israel-to-myanmar-genocidal-projects-are-less-about-religion-and-more-about-predatory-states (Accessed 29 May 2018).

২০ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্পষ্টত মুসলিমদের মধ্য হতে একটি দলকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। সাইয়্যিদ তাঁর *Recalling the Caliphate* , 189-90 এ বলেনঃ মুসলিমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-র সবচেয়ে দৃশ্যমান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে; তারা এই অনন্ত যুদ্ধের ফলে নবউদ্ভূত রাজনৈতিক সচেতনতাকে ধারণ করে নিয়েছে। তাদের থেকে কৌতুকপ্রদ (মুসলিম হিসেবে প্লেনে চড়া), আতঙ্কনীয় (গুয়ান্তানামোয় অনশন করনেওয়ালাদের জোর করে খাওয়ানোর নির্মমতা) এবং বীরত্বমূলক (ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়া এবং বার্মায় প্রাত্যহিক দখলদারিত্বের মধ্যে জীবনযাপনের হয়রানি) গল্প বেরিয়ে আসে। উম্মাহর মধ্যকার কথোপকথন এখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দ্বারা রূপ লাভ করছে, যখন কামালিষ্ট ও ইসলামপন্থীরা এই যুদ্ধের গতানুগতিকতায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

২১ *Times of Israel* , 9 July 2019,

https://www.timesofisrael.com/liberman-future-peace-deal-with-palestinians-must-include-arab-israelis/

২২ এই হাদীস দুইজন সাহাবী দ্বারা বর্ণিতঃ ছাওবান (আবু দাউদঃ ৪২৯৭) এবং আবু হুরায়রা (মুসনাদ আহমেদ) এবং হাসান হিসেবে বিবেচিত।

২৩ *Foreign Affairs* , Summer 1993, 72.3.

২৪ Azad Essa, Muslims being 'erased' from Central African Republic, *Aljazeera* , 31 Jul 2015,

https://www.aljazeera.com/news/2015/07/amnesty-muslims-erased-central-african-republic-150731083248166.html (Accessed 19 Dec 2018).

২৫ Yale University Press, 2017.

২৬ David Wasserstein, How Islam Saved the Jews,

https://kavvanah.wordpress.com/2012/06/04/how-islam-saved-the-jews-david-wasserstein/ (Accessed 7/4/19).)

২৭ মুসলিম/হা ১৩৪২.

২৮ ওরিয়েন্টালিষ্টদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে Patricia Crone and Martin Hinds, *Gods Caliph* (1986) এই বই বের হওয়ার পর থেকে। আর সমসাময়িক মুসলিম রচনাবলীগুলোর মধ্যে এমন অসংখ্য বই বের হচ্ছে যেখানে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর গোড়ার উদাহারণ আবুল আলা মওদুদীর জনপ্রিয় উর্দু কোরআনের তাফসীর তাফহীমুল কোরআন।

২৯ এই ঘটনার গভীর অধ্যয়নের জন্য দেখুনঃ Andrew F. March, *The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought* (Harvard University Press, 2019).

৩০ তুলনা চার্টের জন্য দেখুনঃ David Graeber, *Debt: The First 5000 Years* (2014), 272.

৩১ Noah Feldman, *Fall and Rise of the Islamic State* (2008), xxxix.

৩২ Hüseyin Yılmaz, *Caliphate Redefined: The Mystical Turn in the Ottoman Political Thought* (Princeton University Press, 2018).

৩৩ মিল্লাত ব্যবস্থার ব্যাপারে আরো জানতে দেখুনঃ Teseneem Alkiek, Tolerance, Minorities, and Ideological Perspectives,

https://yaqeeninstitute.org/tesneem-alkiek/tolerance-minorities-and-ideological-perspectives/#.XbckQ-hKheV

৩৪ Wadad Kadi and Aram Shahin, caliph, caliphate, in *Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought* , 85.

৩৫ যদিও যথাযথ ইমামে বিশ্বাস করাটা ছিল শিয়াদের জন্য মূল সমস্যা, ইমামী শিয়াদের পাঁচটি সুপরিচিত ঈমানের ধারা ৫ম শতাব্দী হিজরী/১১শ শতাব্দী খ্রিষ্টাব্দ-এর আগে সুনির্ধারিত হয় নি। দেখুনঃ Mohammed Ali Amir-Moezzi, Early Shīī Theology, in *The Oxford Handbook of Islamic Theology* , 82-3.

৩৬ Patricia Crone, Ibadis, in G. Bowering (ed.), *Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought* (Princeton

University Press, 2013), 230.

৩৭ আল জুয়াইনীর রাজনৈতিক চিন্তার ওপর অধ্যয়নের জন্য দেখুন আমার আর্টিকেলঃ Political Metaphors and Concepts in the Writings of an Eleventh-Century Sunni Scholar, Abū al-Maālī al-Juwaynī, *Journal of the Royal Asiatic Society* , 26.1-2 (2016): 7-18. পুরো ক্লাসিক্যাল সময়ের পরিদর্শন এবং ইবনে তাইমিয়ার উদ্ভাবনী রাজনৈতিক চিন্তার জন্য দেখুন আমার বইঃ *Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment* (Cambridge University Press, 2012).

৩৮ সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত অথবা মুতাওয়াতির হাদীসের পর এটাই সর্বোচ্চ প্রমাণ। Al-Juwaynī, Ghiyāthī, 39-43.

৩৯ Yılmaz, *Caliphate Redefined*.

৪০ *Ibn azm, al-Fi al fi al-milal wa-l-ahwā wa-l-nihal, 4:87.*

৪১ মুতাযিলা ও খারেজীরা সাধারণভাবে এই ফরজিয়্যাতকে স্বীকার করতো। শুধুমাত্র কিছু হাতেগোণা মুতাযিলা, যেমন হিশাম আল-ফুয়াইতি যুক্তি দেখান, গৃহযুদ্ধের সময় কোন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না, এভাবে তিনি আলীর (আ) খিলাফতকে অস্বীকার করেন। নাজাদারতরা ছিল স্বল্পমেয়াদী টিকে থাকা গোঁড়া খারেজী যারা অন্য সব মুসলিমদের তাকফীর করতো এবং যাদের সবসময়ই কোন না কোন ইমাম ছিল, যদিও তারা ইমামতের ফরজিয়্যাতকে অস্বীকার করতো।

৪২ সহীহ মুসলিমের বর্ণিত হাদীসের শব্দগুলো হচ্ছে এরকমঃ যে বাইয়াত দেয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যু জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু। (মুসলিমঃ ৪৭৯৩)।

৪৩ Al-Taftāzānī, *Shar al-Aqā id al-Nasafiyya* (Karachi: Maktabat al-Bushrā, 1430/2009), 35354.

৪৪ প্রাগুক্ত

৪৫ প্রাগুক্ত, ৩৫৫

৪৬ ইন্না নাসবাল ইমাম ওয়াজিব ক্বাদ উরিফা উজুবুহ ফিশ শার বিইজমা আস-সাহাবা ওয়া আত-তাবিয়্যীন, Ibn Khaldun, *al-Muqaddima*, ed. Muammad al-Iskandarānī (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī,2006), 186 (Bk I, sec. 3, ch. 26); এর সাথে F. Rosenthal এর অনুবাদের তুলনা করুন, abridged by N. J. Dawood in Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History* (Princeton University Press, 1967), 156.

৪৭ H. A. R. Gibb, *Studies on Islamic Civilization* (Princeton Legacy Library, 1982 [orig. 1962]), 173.

৪৮ এসব মতামতের সারাংশের জন্য দেখুনঃ □ādiq Nu□mān, *al-Khilāfa al-Islāmiyya* (Cairo: Dār al-Salām, 2004), 26□27;

□Abdallāh al-Dumayjī, *al-Imāma al-□u□mā □inda ahl al-sunnah wa-l-jamā□ a* (Riyadh: Dār □ayba, 1987), 45ff.

৪৯ □Alā□ al-Dīn al-□a□kafī (d. 1088/1677), *al-Durr al-Mukhtār*, 75.

৫০ □Problem Space□ এর এই উপকারী ধারণাটি প্রস্তাবিত হয়েছে নৃতাত্ত্বিক ডেভিড স্কট দ্বারা তার *Conscripts of Modernity* (Duke University Press, 2004) বইয়ে।

৫১ নিচের □নবী (সা) কি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?□ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

৫২ Al-Dhahabī, *Siyar* , 3:372.

৫৩ Al-Bayhaqī, *Shu□ab al-īmān* , 5:75114 vols., ed. Mukhtār al-Nadwī (Riyadh: Maktaba al-Rushd, 2003), 10:15; Ibn Taymiyya, *Minhāj al-sunna* , 1:146.

৫৪ Ibn Taymiyya, *al-Siyāsa al-shar□iyya* , 161□62.

৫৫ Al-Māwardī*, A□kām*, 27.

৫৬ খিলাফতের ক্লাসিক্যাল মডেল ও এর তত্ত্বের ওপর বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার লিখিতঃ *Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment* (Cambridge University Press, 2012).

৫৭ গোড়ার ইসলামী সমাজের বিস্ময়কর সাম্য প্রকৃতি ও এর পেছনে কোরআনী অনুপ্রেরণা ও আরব গোত্রবাদের সাথে যার সংযোগ ঘটার ফলে যা আরো বেশি ফুটে উঠেছে □ এই বিষয়ের ওপর আলোচনার জন্য দেখুনঃ L. Marlow, *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought* (Cambridge University Press, 2002), 1-6; esp. 4.

৫৮ বুখারীঃ ৪৩৫৯

৫৯ Al-Kattānī, 99. The same view is adopted by Ibn Taymiyya, *Majmū□ Fatāwā*, 35:33.

৬০ আল যাহাবী, আল-বায়হাকী এবং ইবনে কাসিরসহ সবাইই এই হাদীসের দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। উদাহারণস্বরূপ দেখুনঃ al-Dhahabī, *Siyar* 3:131.

৬১ Ibn Taymiyya, *Majmū Fatāwā*, 35:22.

৬২ Michaelangelo Guida, Seyyid Bey and the Abolition of the Caliphate, *Middle Eastern Studies* 44.2 (2008),

27589.

৬৩ আতাতুর্ক কিভাবে এত তাড়াতাড়ি ধর্মীয় আলেমদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে পুরো একটি সংস্কৃতিকে বদলে দিলো এসম্পর্কে বলতে গিয়ে হিটলার ১৯৩৮ সালে লেখেন যে, তুর্কী স্বৈরাচারী ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি দেখান, একটি দেশ যে সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে সেটাকে কিভাবে পুনরুদ্ধার ও সংহত করা যায়। আতাতুর্ক একজন শিক্ষক, যার প্রথম ছাত্র মুসোলিনি এবং দ্বিতীয় ছাত্র আমি। Halil Karaveli, Hitlers Infatuation with Atatürk Revisited, https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/367-hitler%E2%80%99s-infatuation-with-atat%C3%BCrk-revisited.html (Accessed 7/4/19). See also Pankaj Mishra, *Age of Anger: A History of the Present* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2017), 131.

৬৪ James Broucek, The Controversy of Shaykh 'Ali 'Abd Al-Raziq, Ph.D. Dissertation (University of Florida,

2012), 128.

৬৫ বিংশ শতাব্দীর বড় বড় আলেমদের মধ্যে যারা খন্ডন লিখেছেনঃ আহমেদ শাকির, মুহাম্মাদ বাখিত আল মুতী, মুহাম্মাদ খিদর হুসাইন, রশিদ রিদা, তাহির ইবনে আশুর। আরবিতে এই বিতর্কের বিশ্লেষণ এবং বিস্তারিতভাবে আসল যুক্তিসমূহ ও এর খন্ডন পড়তে চাইলে দেখুনঃ Muammad Imāras *Marikat al-Islām wa-u ūl al-ukm* (Cairo: Dār al-Shurūq, 1989)

৬৬ উদ্ধৃত হয়েছেঃ Souad T. Ali, *A Religion Not a State* (The University of Utah Press, 2009), 73. এছাড়াও দেখুনঃ James Broucek, The Controversy, 183; and Muammad Imāra, *Ma rikat al-Islām*.

৬৭ এ আয়াতের ওপর তাফসীর ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে জানতে পড়ুন আমার বইঃ *Politics, Law*, 52n59.

৬৮ abarī, *Tārīkh* (Dār al-Turāth), 3:186-7.

৬৯ খুব সম্ভবত আবদুর রাযিক জুয়াইনীর গিয়াছ আল উমাম (যেটা তখনো প্রিন্টেড আকারে প্রকাশিত হয় নি), ইবনে তাইমিয়ার মিনহাজ এবং এ বিষয়ের ওপর হওয়া অন্যান্য ক্লাসিক্যাল গ্রন্থ পড়েন নি শুধুমাত্র মাওয়ার্দী ও ইবনে খালদুনেরটা ছাড়া যাদেরকে তিনি উদ্ধৃত করেন। শিকাগো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আহমেদ আল শামসী আমার সাথে ব্যক্তিগত এক যোগাযোগে বলেনঃ ইবনে তাইমিয়ার

□মিনহাজ□ গ্রন্থ বুলাক্ব প্রকাশনী দ্বারা ১৯০৩-০৫ সময়কালেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু আল-জুয়াইনীর গিয়াছ আল উমাম প্রিন্টেড অবস্থায় তখনো আসে নি।

৭০ □Abd al-Rāaziq, *al-Islām wa-Uu□ ūl al-□ ukm* , quoted in Broucek, □The Controversy,□ 183; also □Imāra, *Ma□ raikat al-Islām* , 395ff.

৭১ Mona Hassan, *Longing for the Lost Caliphate: A Transregional History* (Princeton University Press, 2017).

৭২ Reza Pankhurst□s *The Inevitable Caliphate? A History of the Struggle for Global Islamic Union, 1924 to the*

Present (London: C. Hurst & Co. Publishers Ltd., 2013).

৭৩ Jacob Landau, *Pan-Islamism: Ideology and Organization* (Oxford: Clarendon Press, 1994).

৭৪ উদাহারণস্বরূপ দেখুনঃ Sayyid, *Recalling the Caliphate*, 189.

৭৫ বিশেষ করে দেখুনঃ Sayyid, *Recalling the Caliphate*, chap. 5.

৭৬ Justine Marrozi, □Forget Lawrence of Arabia, here□s the real history of the Middle East and World War I,□ *The*

National , 26 Feb 2015, https://www.thenational.ae/arts-culture/the-long-read-forget-lawrence-of-arabia-here-s-the-real-history-of-the-middle-east-and-world-war-1-1.640119 (Accessed 18 Dec 2018)

৭৭ Fromkin, *A Peace to End All Peace*, 564.

৭৮ Wael Hallaq, *The Impossible State.*

৭৯ Ayubi, *Overstating the Arab State* (1996); আরো দেখুনঃ Sayyid, *Recalling* , 146, যিনি বর্তমান আরব সরকারগুলোকে □মুখাবারাত রাষ্ট্র□ বলে অভিহিত করেছেন।

৮০ উদাহারণস্বরূপ দেখুনঃ Michael Cook, *Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative*

Perspective (Princeton University Press, 2014); Shadi Hamid, *Islamic Exceptionalism: How the Struggle Over Islam Is Reshaping the World* (St. Martin□s Press, 2016).

৮১ কিভাবে জাতিরাষ্ট্রের মডেলের চূড়ান্ত বিজয় অনিবার্য ছিল না সে ব্যাপারে ভালো একটি রেফারেন্স হচ্ছেঃ Hendrik Spruyt, *The Sovereign State and its Competitors* (Princeton University Press, 2006). মোহাম্মদ আল সাইয়্যেদ বুশরাকে এ রেফারেন্সের জন্য ধন্যবাদ।

৮২ Quentin Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, vol. 1 (Cambridge University Press, 1978), ix□x.

৮৩ Tilly, *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990* (Basil Blackwell, 1990), 1□2.

৮৪ Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, trans. George Schwab (MIT Press, 1985), 36.

৮৫ এছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্র একটি জাতীয় রাষ্ট্রও, যা এর আনুগত্যের সীমাকে □ তা স্বীকার বা অস্বীকার করার ব্যাপারকে □একটি জাতীয় সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

৮৬ Hallaq, *The Impossible State*, 155-6.

৮৭ প্রাগুক্ত। এসব গবেষণাসমূহকে উদ্ধৃতকরণ এবং এগুলোর ওপর ভিত্তি করে, হাল্লাক যুক্তি দেখান যে, ক্ষমতার পৃথকীকরণ তত্ত্ব আধুনিক রাষ্ট্রে সাধারণতঃ অকার্যকর এবং প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে উন্নত যুক্তরাষ্ট্রেও এই অকার্যকারিতা পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে নথিযুক্ত হয়েছে। (দেখুন ৩য় অধ্যায়)

৮৮ John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (Harvest/Harcourt Inc., 1964;

orig. 1935), ch. 24, 383.

৮৯ □Abd al-Razzāq al-Sanhūrī, quoted in Mu□ammad □Imāra (ed.), *Islāmiyāt al-Sanhūrī Bāshā*, vol. 1, 335□37.

৯০ প্রাগুক্ত

৯১ George Will, *The Conservative Sensibility* (2019), 157.

৯২ এ ধরনের চিন্তার জন্য রাজনৈতিক তত্ত্বের ওপর যে আলোচনা-প্রতিআলোচনা প্রয়োজন সেটার জন্য দেখুনঃ Chandran Kukathas, *The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom* (Oxford University Press, 2003).

৯৩ এই হাদীস মুতাওয়াতির এবং আলী ইবনে আবু তালিব (রা) সহ আরো অনেক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সহীহ আল বুখারীঃ ৬৯৩০ এবং সহীহ মুসলিমঃ ১০৬৬

সূত্র: Yaqeen Institute for Islamic Research

ওভামির আঞ্জুম

ড. ওভামির আঞ্জুম ক্লাসিকাল ও সমসাময়িক ইসলামী চিন্তার একজন স্বনামধন্য গবেষক। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের টলেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ অধ্যাপক। পাশাপাশি তিনি American Journal of Islam and Society এর কো-এডিটর, Yaqeen Institute এর রিসার্চ ডিরেক্টর এবং Ummahtics এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কাজের মাঝে রয়েছে ধর্মতত্ত, নীতিবিদ্যা, রাজনীতি এবং আইনের সমন্বয় যা ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তা-চেতনার সাথে সংশ্লেষণ করে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর চিন্তা জগতের আগ্রহ ও উদ্দীপনার বিষয়গুলোর মাঝে রয়েছে জ্ঞানতত্ত্বের উৎস (এপিস্টেমোলজি), রাজনীতি, ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব, কালাম, ইসলামি দর্শন ও আধ্যাত্বিকতা ইত্যাদি। বর্তমানে তাঁর অন্যতম গবেষণার বিষয় হলো আধুনিক আন্দোলন, রাজনৈতিক চিন্তা ও আধুনিক ইসলামি চিন্তার সাথে ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল ইসলামি জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা; বিশেষত আরব বসন্তের সাথে এগুলোর বড় ধরণের সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে এ দিকটায় তিনি মনযোগ দিয়েছেন। ইতিহাসে অধ্যয়নের দরুণ লব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে তিনি ক্লাসিক্যাল ইসলামি শিক্ষা, রাজনৈতিক দর্শন ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মতো আন্তঃশাস্ত্রীয় বিষয়ের সমন্বয় ঘটান।

তিনি মেডিসনের ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-এ ইতিহাসের উপর পিএইচডি করেন এবং সামাজিক বিজ্ঞানে মাস্টার্স করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-এ কম্পিউটার সাইন্সে আরেকটি মাস্টার্স করেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে Politics, Law and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment (Cambridge University Press, 2012)। পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু একাডেমিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যার মধ্যে রয়েছে What is Salafism, Salafis and Democracy: Doctrine and Context, Political Metaphors and Concepts in the Writings of An Eleventh-Century Sunni Scholar, Abu al-Maa lī al-Juwaynī, Cultural Memory of the Salaf in al-Ghazali, Sufism without Mysticism: Ibn al-Qayyim's Objectives in Madarij al-Salikin, Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors, Mystical Authority and Governmentality in Islam। এছাড়াও American Journal of Islam and Society-তে Interview with Talal Asad শিরোনামে তালাল আসাদের সাথে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে তিনি আধুনিক ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তি ও মৌলিকতা নিয়ে কাজ করছেন যার ভালো আভাস পাওয়া যায় ইবনে তাইমিয়্যার চিন্তার উপর রচিত তাঁর গবেষণা গ্রন্থে। এ ছাড়াও তিনি প্রায় এক দশক ধরে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) এর আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত দিক থেকে ক্লাসিক মাদারিজ আস সালিকিন (Ranks of Divine Seekers) এর অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ করছেন।